

১.৮ বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের ওপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব

Geographical Influences on Socio economic Life of Bengal

মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক অকৃতিম ও অবিচ্ছেদ্য। প্রকৃতির ছায়াতলে মানুষ জনগ্রহণ করে, বয়ঃপ্রাণ হয় এবং জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। প্রকৃতির বহুবিধ উপাদানের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। সমাজ ও সভ্যতার উত্থান, পতন ও বিকাশের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানের কল্পাণে কৃতিম জগৎ সেচের মাধ্যমে মরণ্দ্যান শস্য শ্যামলায় পরিপূর্ণ হলেও মানুষের জীবন ব্যবস্থায় ভূ-প্রকৃতির প্রভাবকে অশ্বীকার করার কোন উপায় নেই। নিম্নে বাংলার জনগোষ্ঠির ওপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব আলোচনা করা হলো :

১. **খাদ্যাভ্যাস:** মানুষের খাদ্যাভ্যাস নির্ভর করে মূলত ভৌগোলিক অবস্থান, খাদ্যের প্রাপ্যতা, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ওপর। মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিবহুলতার কারণে বাংলাদেশে প্রচুর ধান উৎপাদিত হয়। একারণে এখানকার জনগোষ্ঠির প্রধান খাদ্য ভাত। আর অসংখ্য নদী, খাল-বিল ও জলমগ্ন এলাকা উৎপাদিত হয়। একারণে এখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ফলে প্রকৃতিই বাঙালিকে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছে।

২. **পরিধেয় বন্ধ:** ভূ-প্রকৃতির সাথে পেশাক পরিচ্ছদের সম্পর্ক রয়েছে। শীত প্রধান অঞ্চলে মোটা বা গরম পশমী থাকায় এখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ফলে প্রকৃতিই বাঙালিকে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছে।

৩. **পরিধেয় বন্ধ:** ভূ-প্রকৃতির সাথে পেশাক পরিচ্ছদের সম্পর্ক রয়েছে। শীত প্রধান অঞ্চলে মোটা বা গরম পশমী কাপড়ের প্রচলন এবং গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে হালকা সুতি কাপড়ের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আবার একই দেশে কাপড়ের প্রচলন এবং গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে হালকা সুতি কাপড়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন- শীতকালে আমরা মোটা সুতি কাপড় এবং ঝুতুভেদে গরম ও হালকা সুতি কাপড়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আবার পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীদের পোশাকও প্রকৃতিগত কারণে কিছুটা ভিন্ন। মুঙ্গি, ধূতি, গামছার ব্যবহার ও খালি পায়ে চলার অভ্যাস এদেশের কর্দমাক্ততা ও বৃষ্টি বহুলতার কারণে হয়েছে।

৪. **বসতবাড়ির ধরণ:** ভূ-প্রকৃতির সাথে ঘর-বাড়ির ধরন নির্ভর করে। ঘর-বাড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- বাঁশ, কাঠ, ছন, ইট, পাথরসহ অন্যান্য উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার ভূ-প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশে অধিক বৃষ্টি হয় বলে দো'চালা, চৌ'চালা ঘর তৈরির প্রবণতা রয়েছে। বৃষ্টির পানি যাতে সহজে গড়িয়ে যেতে পারে এজন্যই এ ব্যবস্থা। মধ্যযুগে Building স্থাপত্যেও এই ধারা লক্ষ করা যায়। বাগেরহাটের ঘাটগামুজ মসজিদে চৌচালা ছাদ রীতির প্রচলন দেখা যায়। সুন্দরবনে প্রচুর গোলপাতা পাওয়া যায় বলে সুন্দরবন সংলগ্ন দক্ষিণাঞ্চলের বেশিরভাগ ঘর-বাড়িতে গোলপাতার ব্যবহার দেখা যায়।

৫. **মানসিক ও চারিত্রিক গঠন:** ভূ-প্রকৃতি মানুষের মানসিক ও চারিত্রিক গঠনকেও প্রভাবিত করে। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-যাপন কষ্টসাধ্য হওয়ায় তারা সাধারণত বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান, সাহসী, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে থাকে। অন্যদিকে সমতলে অস্ত পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহ করা যায় বলে সেখানে বসবাসকারীরা পাহাড়িদের চেয়ে অলস প্রকৃতির ও শ্রমবিমুখ হয়ে থাকে। জীবিকা নির্বাহের জন্য অধিক সময় ব্যয় করতে হয় না বলে জনগোষ্ঠীরা শিল্প-সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান চর্চায় মনযোগী হয়। কৃষির ওপর অত্যধিক নির্ভরতার কারনে এদেশের মানুষ পরম্পরাপেক্ষী ও ভাগ্য বিশ্বাসী। কোন বছর বেশী ফসল হলে বাঙালিরা একে প্রকৃতির আশীর্বাদ হিসাবে মনে করত। এ কারনে বাঙালি সমাজে খুব সহজে কুসংস্কার ও অক্ষবিশ্বাস চুকে যায়।

৫. সামাজিক ও পারিবারিক জীবন: কক্ষিকান্তি যেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মৌসুমী দারু বাংলাকে দিয়েছে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু। এ জলবায়ু প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের করেছে শাস্ত্র, অমায়িক ও অসম্ভাব্য। পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক সম্পর্ককে করেছে শক্তিশালী। এর ফলে বাংলায় গড়ে উঠেছে একান্নবঙ্গী পরিবার প্রথা।
৬. সংখ্যামী জীবন: মৌসুমী আবহাওয়া ও অবস্থান এদেশকে যেমন শস্য শ্যামলা করেছে তেমনি সময়ে সময়ে প্রতিকূল আবহাওয়াও সৃষ্টি করেছে। বন্যা, ঝড়, ঝঁঝা ও নদীর ভাঙ্গা গড়ার সাথে লড়াই করে এদেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। বাংলার আবহাওয়া, জলবায়ু ও অবস্থান বাংলাকে করেছে সংখ্যামী, শিখিয়েছে সংখ্যাম করে বেঁচে থাকার উপায়। উপকূলীয় অঞ্চলে বার বার ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস আঘাত হানার পরও সেখানকার জীবন থেমে যায়নি, নতুন করে তারা আবার জীবন তৈর করেছে।
৭. নৌ-প্রধান সংস্কৃতি: নদীমাত্র বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য নৌকা। নদীকে কেন্দ্র করে মাঝির গান ভাটিয়ালি বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম দিক। নদীর উৎপত্তি, ভাঙ্গা-গড়া, নৌ-বাণিজ্য ইত্যাদি বাংলার মানসিকতায় প্রভাব ফেলেছে। এই সুখ-দুঃখকে নিয়ে তারা গান, কবিতা ইত্যাদি রচনা করেছে-

“এ কূল ভাঙ্গো ও কূল গড়ো

এই তো নদীর বেলা।

সকালবেলা আমির রে ভাই

ফকির সন্ধ্যাবেলা।”

- এছাড়া বাংলা নদী প্রধান দেশ হওয়ায় এখানে নৌশিল গড়ে উঠে। অঞ্চলভেদে নৌকার আকার-আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। আদিকাল থেকেই এদেশে নৌ প্রযুক্তি গড়ে উঠে যা শিল্পে রূপ নেয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের নৌকার গলুই অপেক্ষাকৃত বেশি উচুঁ। কারণ নদীর ঢেউ গলুটিয়ে বাধাধারণ হয়ে নৌকাকে রক্ষা করে। এছাড়া দেশের সর্বত্র বিরাজমান সুন্দর প্রকৃতি এদেশবাসীকে দিয়েছে শিল্প মন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি। সাথে সাথে করেছে কল্পনাপ্রবণ।
৮. ইতিহাস: বিশ্ব দরবারে বাংলার গর্ব করার মতো যে কয়টি জিনিস তার অন্যতম বাংলার সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্র এবং টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প। প্রিস্টপূর্ব তিন শতক থেকে বাংলার সূক্ষ্ম বস্ত্র ‘মসলিনের’ ব্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। দুটি কারণে বাংলায় মসলিন কাপড় তৈরি সম্ভব হয়েছিল।

- (১) কাঁচামালের সহজলভ্যতা;
- (২) উপযুক্ত আবহাওয়া।

সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র তৈরির যে বিশেষ তুলা তা বাংলার শীতলক্ষা থেকে মেঘনা এই মধ্যবঙ্গী এলাকায় উৎপাদিত হতো। আর সূক্ষ্ম সুতা তৈরি ও সুতা কাটার যে স্যাঁতস্যাতে আবহাওয়া দরকার তা এখানে ছিল। এখনো বস্ত্র তৈরির ঐতিহ্য এ অঞ্চলে রয়েছে। অন্যদিকে বাংলার একক ও অনন্য শিল্প টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্প। বিশেষ বড় বড় জাদুঘরে বাংলার পোড়ামাটির শিল্পের নির্দর্শন সংরক্ষিত আছে। উপযুক্ত মাটি ও কারিগর সহজলভ্য হওয়ায় টেরাকোটা শিল্প বাংলায় গড়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। কষ্টিপাথর ও কাঠের কাজের শিল্পও বাংলার অন্যতম ঐতিহ্য। বর্ধাকালে ঘরের বাইরে যাওয়া যায় না বলে বাংলার নারীরা ঘরে বসে নকশী কাঁথা তৈরির কাজ করেছে যা বিশেষ শিল্পে রূপ নিয়েছে।

- ৯. সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ:** সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে ভূ-প্রকৃতির সম্পর্ক গভীর। আদোর সহজলভ্যতা বসবাসের উপযোগী পরিবেশে জনসম্মতি গড়ে তোলা মানবের সামাজিক দর্ম। অতিরিক্ত শীতল জলবায়ু সভ্যতা বিকাশের পথে অঙ্গরায় সৃষ্টি করে। ভূ-প্রকৃতিগত পরিবেশ, আদোর সহজলভ্যতা ও নদী পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা কারণে মহাজ্ঞানগড়ে প্রাচীনকালে সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়। এছাড়া তামালিষ্ট, কর্ণসূরণ, ময়নামতি, ওয়ারীবটেক্স প্রভৃতি সভ্যতার বিকাশ বাংলায় ঘটে।
- ১০. নগরায়ন:** নগরায়নের সাথে ভূ-প্রকৃতির সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশের ফলে যে নগর জীবনে উত্তৰ হয়েছে সেগুলো অধিকাংশই নদী অববাহিকায় গড়ে উঠেছে। সন্তায় পথ্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার কারণে বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ বর্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর অন্যান্য বড় শহর, এমনকি ছোট ছোট জেলা শহর গড়ে উঠার সাথে নদীর সম্পর্ক রয়েছে।
- ১১. কৃষিক্ষেত্রে:** ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী জলবায়ু, আবহাওয়া তথা পরিমিত বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রা দুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বন্দোপসাগর থেকে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পাহাড়ে বাধা পেয়ে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ফলে এসময় অল্প পরিশ্রমে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হয়। অন্যদিকে শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু পাহাড়ে বাধা পেয়ে পরিমিত বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে শীতকালে প্রচুর রবিশস্য উৎপাদিত হয়। যদিও কৃত্রিম জলসোচ ব্যবস্থা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ প্রদানের মাধ্যমে বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে তবুও কৃষিক্ষেত্রে প্রকৃতির অবদানকে অধীক্ষার করার কোনো উপায় নেই।
- ১২. শিল্পক্ষেত্রে:** যে কোনো দেশে শিল্পের বিকাশের সাথে ভূ-প্রকৃতির একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসব অঞ্চলে কাঁচামাল সহজলভ্য অথবা সহজেই আমদানি করা যায় সেখানে শিল্প গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের চা, চিনি ও পাট শিল্পের বিকাশের সাথে কাঁচামাল প্রাপ্তির সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্পসহ শ্রমগন শিল্পের বিকাশের সাথে সহজলভ্য ও সন্তায় শ্রমিক প্রাপ্তির সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে কমলা, পেট্রোলিয়াম, সৌহ ইত্যাদির অভাব থাকার কারণে বাংলাদেশে ভারী শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি।
- ১৩. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:** যানবাহনের ধরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভূ-প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল নিম্ন ও নদীবহুল বলে সেখানে লঘু, স্টিমার, নৌকা, ডেলা ইত্যাদি ব্যবহার হয় বেশি। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ অপেক্ষাকৃত উচু বলে সেখানে গন্ধ-মহিয়ের গাড়ি, বাস, ট্রাক ইত্যাদি বেশি ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে পাহাড় অঞ্চলে সেখানকার ব্যবহার উপযোগী যানবাহন ব্যবহার করা হয়।
- ১৪. বহিঃবিশ্বের সাথে যোগাযোগ:** অতি প্রাচীনকাল থেকে বহিঃবিশ্বের সাথে বাংলার যোগাযোগ ছিল। সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি-উপজাতি-ব্যবসায়ী এদেশে এসেছে। গ্রীক, আরব, পর্তুগীজ, ডাচ, দিনেমার, ফরাসি ও ইংরেজরা এদেশে এসেছে। সম্বৰত ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলো বাংলা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বার্মা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশে ব্যবসা পরিচালনা করত। বাংলা ব্যবসায়-বাণিজ্যের ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৫. রাজনৈতিক প্রভাব: বাংলার প্রাকৃতিক সীমারেখা, মদ-নদী, অসাধুমি, দীর্ঘস্থায়ী বর্ষাকাল, কর্দমাক্ষেত্র, সাপ, ইত্যাদি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য হিসাবে কাজ করেছে। উভয় ভারত থেকে বাংলায় প্রবেশের পথ ছিল সহজীব্র ও দুর্গম। ফলে বহিআক্রমণ সহজে প্রতিহত করে এদেশ স্বাধীন হোকেছে। মহাদীর আলেকজান্ডারের অভিযানও বাংলার সীমা গঙ্গাতীরে এসে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিশাল গঙ্গা নদী অভিজ্ঞমে দ্বার্প হয়ে ছিনি ছিলে যান। আবার কখনো কোনো রাজা বাংলা অধিকার করলেও বৃষ্টি, কাদা, সাপ, মশা ইত্যাদি তাদেরকে এদেশ ঢাকতে দাদা করেছে। একারণে এখানকার শাসকরা ভারতের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করে স্বাধীন পাকার চেষ্টা করেছে। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাকে 'বলগাকপূর' বা 'বিদ্রোহের নগরী' বলে উল্লেখ করেছেন।

১৬. ধর্মীয় প্রভাব: ধর্মীয় ক্ষেত্রে বাংলার কিছু নিজস্বতা রয়েছে। যেমন- হিন্দুদের দেবতার ক্ষেত্রে উভয় ভারতে পুরুষ দেবতার (বিষ্ণু বা শিব) প্রাধান্য থাকলেও বাংলায় নারী দেবতার (দূর্গা, দ্বরহতী, লক্ষ্মী, শ্যামা, দনুনতি ইত্যাদি) প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এর কারণ সম্ভবত আর্য-পূর্ব বাংলায় মাতৃকা (Mother love) ছিল উরুচুপূর্ণ যা দেব-দেবীর মধ্যেও বিস্তার ঘটেছে। আর্মর্মা আসার পরও তা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া বিশ্বের অনুষ্ঠানে গান্ধে হলুদ, ধান, দুর্বাঘান, হলুদ, কলাগাছ ইত্যাদির ব্যবহার বাংলার নিজস্ব গৌরী। মুসলমানরা আসার পর তাদা ও ধৰ্ম করেছে। খিলান মাহফিল বা বাতি জ্বালিয়ে শব-ই-বরাত পালন এদেশীয় ঐতিহ্য থেকে মুসলমানরা ধৰ্ম করেছে।

সুতরাং, বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া ও জলবায়ু এদেশের জনজীবনে উরুচুপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আহার-বিহার, বেশভূষা হতে শুরু করে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। অধ্যাপক নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, "সমুদ্র যেমন করেছে বাঙালিকে সামুদ্রিক ও ব্যবসায়িক, তেমনি হিমালয় ও সমুদ্রের মাঝবানে যে নাতিবীতোষ্ণ মণ্ডল তা করেছে বাংলাকে সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা।" ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি বাংলাকে একটি নিজস্ব সন্তোষ দিয়েছে যা বাঙালিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সহায়তা করেছে। কোনো ধর্ম-সংস্কৃতি বাইরে থেকে আসলেও বাংলা তার নিজস্বতা পুরোপুরি ত্যাগ করেনি, বরং নিজের মতো করে একে ধৰ্ম করেছে। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় বাংলার এই বৈশিষ্ট্যকে 'বৈতসী বৃষ্টি' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্ধাৎ বেতস নতুর মতো সাময়িক মুঝে পড়লেও পুনরায় অনুকূল পরিবেশে স্বমহিমায় 'ভাস্ব' হয়েছে।

ইউনিট

২১

শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা আন্দোলন Sheikh Mujibur Rahman and the Six Point Movement

মোসা: তাহেরা বুলবুলী'

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত বৈষম্য ও দীর্ঘ শোষণাদি চলতেই থাকে। ফলে ১৯৬৬ সালের ৫ মেত্রিয়ার লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্ত্বাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা উল্লেখিত হয়েছিল। শেখ মুজিব এই দাবিকে ‘আমাদের বাঁচার দাবি’ শিরোনামে প্রচার করেছিলেন। ছয় দফা দাবির মূল বিষয় ছিল একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত পাকিস্তানি ফেডারেশনে হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ কারণে তিনি উক্ত সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্�্পন আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী সফল পরিচালনা করেন। প্রায় পুরো দেশ ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে আটক হন। বছরের প্রথম চতুর্থাংশেই তাঁকে আটকার আটক করা হয়েছিল। এবং ঢাকায় বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে আটক হন। বছরের প্রথম চতুর্থাংশেই তাঁকে আটকার আটক করা হয়েছিল। ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবন্ধ বাঙালি জাতি ৬ দফাকে জাতীয় মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে।

২১.১ ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি

Background of Six Point Movement

১৯৪৭ সালের ১৪ অগস্ট দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য হয়, যা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দু ভাগে বিভক্ত ছিল। ভৌগোলিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাণ্ডা অন্তর ও শুধু ধূর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তর হয়। ছয় দফা দাবি উত্থাপন পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইতিহাসে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে পূর্বাঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ঔপনিবেশিক মনোভাব, এ অঞ্চলের জনগণ ও রাজনীতিবিদদের অবমূল্যায়ন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ, সামরিক দিক থেকে অবহেলা প্রতিক্রিয়া করণ ছয় দফা দাবিকে যুক্তিযুক্ত করে তুলেছিল।

১. রাজনৈতিক পটভূমি: ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য হলেও পূর্ব পাকিস্তানকে কখনোই লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক স্বায়ত্ত্বাসনের অধিকার দেওয়া হয়নি। ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন ও গণযুক্তি সংবিধান প্রণয়নের কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েও পশ্চিমা সরকারের যত্নে যুক্ত্যন্ত সরকার সফল হতে পারেনি। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারির মধ্য দিয়ে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়। ১৯৫৯ সালে ‘মৌলিক

^১ প্রতার্ক, ইতিহাস বিভাগ, নড়াইল সরকারি ভিত্তোরিয়া কলেজ, নড়াইল।

'গণতন্ত্র' নামক অগণতাত্ত্বিক ব্যবস্থা চালু করে ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে নির্বাচনের নামে প্রহসন চলে। এ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের উপর সব সিদ্ধান্ত মূলত কেন্দ্র থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দীর্ঘ দিন পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জরুরি অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের ছিল না। গবেষক ড. প্রীতিকুমার মিত্র এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বন্দের মধ্যকার গণতাত্ত্বিক ও জাতীয়বোধের বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি 'বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-১৯৬৬' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ১৯৪৭ সালের পর থেকে পাকিস্তানে একাধিক বিরোধি রাজনৈতিক দল ও তাদের অনুসারী ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠে। এর ফলে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও অপর দিকে রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলন দেশবাসীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান তার ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

২. প্রশাসনিক পটভূমি: পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি পর্যন্ত সকল স্তরে পূর্ব পাকিস্তানিদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য সংখ্যক। পরিকল্পিতভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের নিয়োগ করা হয়নি। পাকিস্তান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হাসান আশকারী রিজিভি একটি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন আইয়ুব আমলে মোট ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ২২ জন ছিল বাঙালি। এ ২২ জনের মধ্যে কাউকেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এজন্যই ৬ দফায় স্বায়ত্ত্বাসনের অধিকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সীমিত ক্ষমতা এবং আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি উত্থাপিত হয়েছিল।

৩. অর্থনৈতিক পটভূমি: পাকিস্তানের প্রায় সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা ও বৈদেশিক মিশনসমূহ পশ্চিমাংশে থাকার কারণে অর্থের মজুদও গড়ে উঠে সেখানে। পূর্বাংশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের নিজস্ব ক্ষমতা নেই-এ অজুহাতে সকল বৈদেশিক মুদ্রাই পশ্চিমাংশে চলে যেত। তাছাড়া চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের সংখ্যাধিক্য থাকায় এ সমস্ত আয় মূলত তারাই ভোগ করত। ১৯৬১ সালে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয়-ব্যয়ে দুই প্রদেশের অবদান নিয়ে একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অবদান ২২% এবং চলতি ব্যয়ে হিস্যা হলো ১২%। পূর্ব পাকিস্তানিদের আমদানি ও আয়কর শুল্ক পশ্চিম পাকিস্তানে জমা দিতে হত। আবার রঙানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত মোট আয়ের ৬০% আসে পূর্ব আঞ্চল থেকে। কিন্তু আয়ের ক্ষেত্রে বেশি হলো ভোগ ও উন্নয়ন ব্যয়ে ন্যায্য অংশ পেত না।

১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় হয়েছিল ৯৭০ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২,১৫০ কোটি টাকা। অথচ আয়ের ক্ষেত্রে দু প্রদেশের চির ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বহির্বাণিজ্যের প্রথম ১০ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান যেখানে ৪০৭.৬ কোটি টাকার ঋণাত্মক ভারসাম্য ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে সেখানে ৮৬৮ কোটি টাকা ঋণাত্মক ভারসাম্য বজায় রাখে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারিতে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান ২০০ কোটি টাকার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেয়। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এ সময় প্রতি বছর প্রায় ৪০ কোটি টাকার বৈদেশি দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে। পশ্চিমাঞ্চলের বৈদেশিক ঋণের বোঝা মেটানো হতো পূর্ব পাকিস্তানের ঋণাত্মক আয় থেকে। ১৯৫৬ সালের পূর্বে প্রতি বছর জাতীয় আয়ের ২% পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে পাচার হতো। এরপ বৈষম্য মূলক নীতি ও শোষণের প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৬ ছয় দফা উত্থাপিত হয়।

৪. সামরিক পটভূমি: ছয় দফা উত্থাপনে সামরিক প্রেক্ষাগৃহ ছিল অত্যন্ত উৎপূর্ণ। পাকিস্তান রাষ্ট্রে সর্ববিহু, সে বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের অধীন ছিল প্রায় স্বল্প সংখ্যক। সামরিক বাহিনীতে ১০%-এর বেশি পূর্বপাকিস্তানি ছিল না। সবচেয়ে প্রধানত পিস্তল ও হাতে কান্ধে সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান সামরিকভাবে অবক্ষিত ছিল। সদাব্য ভারত আক্রমণ প্রতিক্রিয়া করে পূর্ব কোনো শক্তি পূর্বৰ্থকলে ছিল না। সামরিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীন সম্পূর্ণতা অর্জন সময়ের দর্শন চাপে দেখা যায়।

২১.২ ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবিসমূহ

Six Point Demands of 1996

ছয়দফা দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তান বা বাঙালির জাতীয় 'মুক্তি সনদ' (Magnacarta of Bengalis)। এ কর্তৃত ১৯৬৬ করার সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি বলে অবিহিত করেন। তবে দলের নিম্নরূপ:

প্রথম দফা: শাসনতাত্ত্বিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি: ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক দাহোর প্রতিতে সরলভে বৈশিষ্ট্য হবে Federal বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয় পদ্ধতির; তাতে যুক্তরাষ্ট্রের অপরাজ্যগুলো থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সর্বজনীন প্রাণবয়ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। প্রদেশগুলোকে পূর্ব পার্যবেশন দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচন জনসংখ্যার ভিত্তিতে হবে।

দ্বিতীয় দফা: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা:

কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও মৌলিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অপরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

তৃতীয় দফা: মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা:

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'টি পৃথক মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে, প্রারম্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিয়য়যোগ্য। এক্ষেত্রে দু'অঞ্চলে প্রত্যন্ত বা পৃথক পৃথক স্টেট ব্যবস্থা এবং মুদ্রার পরিচালনা ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। অথবা, এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একটি মুদ্রাব্যবস্থা চালু থাকতে পারে এই শর্তে যে, একটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি বিচার ব্যাংক থাকবে। তাতে এমন বিধান থাকতে হবে যেন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পূর্ণ হস্তান্তর কিংবা মূলধন পাচার হতে না পারে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য সংবিধানে কর্তৃস্বীকৃত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

চতুর্থ দফা: রাজস্ব কর ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা:

সকল ধর্মান্বকার রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অপরাজ্যগুলোর হাতে। কেন্দ্রীয় তথা প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের বায় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্বের বেগের আঞ্চলিক তহবিল হতে সরবরাহ করা হবে। সংবিধানে নির্দেশিত বিধানের বলে রাজস্বের এই নির্ধারিত অর্থ স্বাভাবিকভাবেই ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। এহেন সাংবিধানিক বিধানে এমন নিষ্যতা থাকবে যে, স্টেট সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারটি এমন একটি অক্ষেয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে যেন রাজস্বনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকে।

পক্ষ দফা: বৈদেশিক বণিক্য ক্ষমতা: পক্ষম দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে নিম্নলিপি সংবিধানিক বিধানের মুগাইশ করা হয়: (ক) ফেডারেশনভূত প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের বহির্বিদ্যুতির পৃথক পৃথক হিসেবেরক্ষা করতে হবে; (খ) বহির্বিদ্যুতির মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলোর একত্বিয়ারে পাকবে এবং অঙ্গরাজ্যের প্রত্যোজ্ঞে অঙ্গরাজ্য কর্তৃক ব্যবহৃত হবে। (গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অপরো সর্বসমত নির্দিষ্ট হবে অঙ্গরাজ্যগুলো মিটাবে। (ঘ) অঙ্গরাজ্যের মধ্যে দেশজ দ্রব্য চলাচলের ক্ষেত্রে উক্ত বা করজাতীয় কোনো বাধা থাকবে না। (ঙ) সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণের এবং য য স্বার্থে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

ষষ্ঠ দফা: আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা: (ক) আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বাহিনী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। (খ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল শাখায় বা চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিট থেকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ করতে হবে। (গ) নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর করাচি থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তর করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ছয় দফা ছিল মূলত পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র স্বত্ব হিসেবে বাঁচার দাবি। অর্থনৈতি ও রাজস্বনীতির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণছাড়া যে রাজনৈতিক স্বায়ত্ত্বাসন সন্তুষ্ট নয় তা ঐ দাবির মধ্যে স্পষ্ট। এ কর্মসূচীকে সামনে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু করে তা পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এভাবে দেখা যায় ছয় দফা কর্মসূচী ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।

====

ઇઉનિટ

অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, অপারেশন সালট

Non Co-operation Movement, Address of 7th March, Operation Searchlight

۲۹

নুরজাহান আলেক্সার

২৭.১ অসহযোগ আন্দোলন

Non Co-operation Movement

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ অভ্যরণ পূর্ব পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনটি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের উরুতৃপূর্ণ অধ্যায়। ক্ষমতা হত্তাত্ত্বে ইয়াদিয়া বাদের পাঠ্মনি ও পার্বিলেন পিপলদ পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর অসহযোগিতা ছিল এ আন্দোলনের প্রধান কারণ। এ আন্দোলনের বাস্তি ছিল মুক্তি ব্যবস্থা ও তৎপর্যপূর্ণ।

২৭.২ অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি

Background of Non Co-operation Movement

১. ১৯৭০ এর নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীয়া: ১৯৭০ সালের সাধারণ ও আদেশিক পরিবহন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরক্ষুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সেন্ট ও থেসেন্স সরকার গঠিত হবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শান্তক ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে অন্য টুলবাহিন করতে থাকেন। নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান ও মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিবহনের অধিবেশন আহরণ করেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের তারী এবং নবজীবনেরও অব্যাহিত করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ভুলফিকার আলী ভুঞ্চো-সর্বিধান প্রশ়্নে পাকিস্তানের দুই সুইচ লক্ষ্য (আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি) মধ্যে একটি সমবেতা না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিবহন অধিবেশন যোগদান না করার ঘোষণা দেন। ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিবহনের অধিবেশন স্থগিত বোর্ড করেন। এ সরকার প্রচারিত ইওয়ার সাথে ছাত্র-জনতা রাজপথে বিক্ষেপে কেটে পড়ে।

³ प्रभाषक, इतिहास विभाग, सरकारी दूल्होल लेखा, पाठ्यन.

২. অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিক্রিয়া: প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনিদিচ্ছালের জন্য স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৩ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সমগ্র বাংলায় হরতালের ডাক দেন। ২ মার্চ রাতে কারফিউ জারী করা হয়। কারফিউ ভঙ্গ করে ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসে। ১ মার্চ থেকেই কার্যত পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ২ এবং ৩ মার্চ হরতালের ফলে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। প্রদেশটির যোগাযোগ সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোনো কোনো ছাত্র এবং শ্রমিক সংগঠন স্বাধীনতার ঘোষণার দাবি করতে থাকে।
 ৩. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কর্মসূচি: ২ মার্চ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন প্রাপ্তনে এক সভার আয়োজন করে। ঐ সভায় তারা সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ৩ মার্চ ঢাকায় পল্টন ময়দানের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। প্রস্তাবে বলা হয়: “এই সভা পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতাত্ত্বিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক অধিকার কায়েমের শপথ গ্রহণ করছে। এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রেখে তার সকল সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। এই সভা দলমত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নর-নারীকে স্বাধীন সার্বভৌম ‘বাংলাদেশ’ গঠন করার নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।”
- সভায় ‘স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি’ শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয় (ইশতেহার নং-এক)-এতে বলা হয় যে, তিনটি লক্ষ্য অর্জন করার জন্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করা হবে। লক্ষ্যগুলো হল:
১. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
 ২. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকলে সমাজতাত্ত্বিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ্য কায়েম করতে হবে।
 ৩. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

প্রস্তাবে বাংলাদেশের কথিত স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধা গ্রহণ করার কথা বলা হয়:

১. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি’ গঠন করতে হবে।
২. সকল শ্রেণির জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদের এক্যবন্ধ করতে হবে।
৩. শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে।
৪. হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।
৫. স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে বিয়ে যাবার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং শুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

উক্ত ইশতাহারে উল্লেখ করা হয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক। ইশতেহারে নিম্নলিখিত স্লোগান উচ্চারণের আহ্বান জানানো হয়:

‘স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ-দীর্ঘজীবী হউক; স্বাধীন কর স্বাধীন কর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর; স্বাধীন বাংলার মহান নেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব; গ্রামে গ্রামে দুর্গ কর-মুক্তিবাহিনী গঠন কর; বীর বাঙালি অন্ত ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর; মুক্তি যদি পেতে চাও-বাঙালিরা এক হও।’

২৭.৩ শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদের প্রস্তাব

Proposal of Revolutionary Council of Labour Movement

মার্চের ২ তারিখে পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশে প্রচারিত এক খোলা চিঠিতে সশন্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। খোলা চিঠির বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

“আপনার পার্টির ছয়দফার সংগ্রামের রক্ষণাত্মক ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, ছয়দফার অর্থনৈতিক দাবিদণ্ডন বাস্তবায়ন সম্ভব সশন্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন কর। আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ববাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোট প্রদান করেছে পূর্ববাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য।

পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের প্রতি পূর্ববাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবলী পেশ করেছে:

পূর্ববাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের বেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তি পূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করুন। পূর্ববাংলার ক্ষমক শ্রমিক প্রকাশ ও গোপনে কার্যরত পূর্ববাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্মিলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন।”

২৭.৪ ২-৬ মার্চের কর্মসূচী ও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনঃ আহ্বান

Program of 2-6 March an Recall the Session of National Council

২ মার্চ হরতাল চলাকালীন সময়ে পুলিশের গুলিতে ২জন নিহত এবং কয়েকজন গুরুতর আহত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দিন সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিম্ন প্রকাশ করেন এবং ৭ মার্চ আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচিতে বলা হয়:

৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল। ৭মার্চ বেলা ২টায় রেসকোর্স ঘয়দানে জনসভা। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রলীগ আয়োজিত এক জনসভায় তার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। যে পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা না হবে সে পর্যন্ত সকল ধরনের ট্যাক্স প্রদান বন্ধ রাখার জন্য তিনি জনগণকে নির্দেশ দেন। এ পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসন করার উদ্দেশে ১৯৭১সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারি ফ্রপের ১২ জন নির্বাচিত সদস্যকে প্ররোচনা ১০ মার্চ ঢাকায় মিলিত হবার আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ ঐরূপ বৈঠকে বসতে অস্বীকৃতি জানায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও নূরুল আমিনসহ জামায়াতে

ইসলাম, জমিয়তে ইসলাম (হাজারী গ্রাম), কন্ডেনশন মুসলিম লীগ ও আরোও কিছু দলের মেটুন্স বৈঠকে ঘোষণার জন্মকার করায় প্রত্যাবিত এই বৈঠক বাতিল করে দেয়া হয়।

অবশেষে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে ২৫ মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিবহন প্রতিবেশন আহ্বান করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন:

আমি এ কথা পরিকার করে বলে দিতে চাই যে, পরে কি ঘটবে তাতে কিছু যায় আসে না। কিছু প্রক্রিয়ান সম্ভব বাহিনী হতদিন আমার কর্মাণ্ডে আছে এবং যতদিন আমি রাষ্ট্রপ্রধান আছি ততদিন আমি পাকিস্তানের পূর্ব সংজীবিত সজায় রাখব। এ যাপারে কেউ যেন কোনো সন্দেহ কিংবা ভাস্ত ধারণা পোষণ না করেন। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এদেশ রক্ষা করার দায়িত্ব আমার রয়েছে। দেশবাসী আমার কাছ থেকে তা আশা করে এবং আমি জানের নির্বাপ করব না।

মার্চ (১৯৭১) ইয়াহিয়া খান একটি শুরুত্তপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন আনেন। তিনি কঠোর প্রকৃতির সামরিক অফিসার জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, আলোচনার অন্তর্বালে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা শুরু করে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই জাতীয় সংস্থা পিআইএ-কে করে বেসামরিক পোশাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে আসা হয়। সিনিয়র আর্মি অফিসার ও বড় বড় ব্যক্তিগোষ্ঠী সম্মানের পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সেই সাথে নগদ টাকাও পাচার করা হচ্ছিল ব্যাপকভাবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জানানো হয় যে, সেনাবাহিনী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অবাঞ্চালি অন্তর্বিত এলাকাগুলোতে গোপনে অন্তর্শন্ত্র বিতরণ করছে। পাকবাহিনীর এইরূপ অবহৃত পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবের উপর চারিদিক থেকে এককভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছিল। সেনাবাহিনীর বাঞ্চালি অফিসার ও সৈন্য, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ সবাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপনে জানান যে, একুশ কোনো ঘোষণা দিলে তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন দেবেন।

২৭.৫ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

Address of Bangabondhu on 7th March

এমনি প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ(১৯৭১) রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ (যা 'বঙ্গবন্ধুর দাঙ্গু মার্চের' ভাষণ নামে অভিহিত হয়েছে) দেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষণ (টেপেরেকর্ড থেকে লিপিবদ্ধ সংক্ষেপিত)

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলেই জানেন এবং বোধেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বংশুরে আমার ভাইয়ের ইতে বাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আঘাতে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেসলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গঢ়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের কর্মসূল ইতিহাস, বাংলার মানুষের ইতের ইতিহাস-এই রক্তের ইতিহাস, মুর্মুর্ম মানুষের কর্মসূল আর্তনাদ-এদেশের কর্মসূল ইতিহাস, এদেশের মানুষের ইতে বাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

২৫ তারিখ এসেছিল জেফেছে। রাতের দাগ করা গাছ। ১০টারিখে শলেষি, রকে পাখা দিয়ে, শহীদের উপর পাখা দিয়ে, এসেছিল খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল-ল'..... করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের বাবকে ভিতর চুক্তে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর আমগণের পতিনিধির কাছে কহলু হজার করতে হবে। তারপর বিমেচনা করে দেখল আমরা এসেছিলিতে নসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে এসেছিল আমরা বসতে পারি না।

আমি শ্রধানমজ্জিত চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিস্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আমি দেবে এই বাংলাদেশ কোট-কাচানি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনিদিষ্টকালের জন্য বন্ধ পারবে। পরিসের যাতে কষ্ট ন হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে। সে জন্য যে-সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলি হরাতাল কাল পেকে চলবে। রিকশা, গৃহস্থগাড়ি, মেল চলবে শুধু সেকেটরিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জাজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট মন্ত্র, প্রেস কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখ কর্মচারিনা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন, এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর কৈ একটি খুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, অত্যেক ঘরে ঘরে দুর্ঘ হবে তোল। তোমাদের যা-কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাদাটি যা না আছে সবকিছু আমি যদি হ্রস্ব দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা আতে মারব, আমরা পানিতে মারব। সৈন্য, তোমার আমার ভাই, তোমরা ব্যাসাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু তোমরা কুলি করবার চেষ্টা করবে ন। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যথন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারব না।

আর যে-সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আধাতপ্তাণ হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের পেকে যদুর পারি নাহ্য করতে চো করব। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকাপয়সা পৌছে দেবেন। আর ৭ দিন হরাতালে ফেব শ্রীক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, অত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছে দেবেন। সরকারি কর্মচারিদের বলি, অতি য বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হব কেই দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পিছনে চুক্তে, নিজেদের মধ্যে আত্মকপছ সৃষ্টি করবে, শুটত্রাজ করবে। এই বাংলাত হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালি, অবাঙালি তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের মেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারিনা, রেডিও যদি আমাদের কথা না উনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশন যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপ্তি নিতে পারবে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে ন। টেলিফোন, টেলিথ্রাম আমাদের পূর্ববাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খত্ম করার চেষ্টা চলছে-বাঙালিনা বুরোসুবো কাজ করবেন। অত্যেক ধারে, অত্যেক বক্তুর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিয়দ গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রতুত ধাক্কুন। রক ইবন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মৃত্যু করে তুলন ইনশাআপ্তাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

(সূত্র: স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, পৃ ৭০০-৭০২)

২৭.৬ ৭ মার্চ ভাষণের বিষয়বস্তু
Subject matter of the Address of 7th March

- এই ভাষণ বিশ্লেষণ করলে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুটো উচ্ছেশ্য সূক্ষ্য কৃতি:
১. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম-এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।
 ২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন:
 ১. অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে;
 ২. অবিলম্বে সব সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে;
 ৩. প্রাণহনি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে;
 ৪. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর (জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই) করতে হবে।

তিনি এই দাবিগুলো উত্থাপন করে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখেন।

উল্লেখ যে, এই শর্তগুলো মানলেই যে আওয়ামী লীগ ২৫ মার্চ ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে- এমন কোনো নিশ্চয়তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণে দেননি। বরং তিনি বলেছেন যে এই শর্তগুলো গ্রহণ করা হলে, ‘তখন বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেস্বলিতে বসতে পারব কি পারব না’।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে ঘোষণা দেন।

৭ মার্চ তিনি এক ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তী সাতদিন আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য দশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যা ছিল নিম্নরূপ:

১. কর না-দেওয়ার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।
২. সমগ্র বাংলাদেশের সেক্রেটারিয়েট, সরকারি এবং আধা-সরকারি দণ্ডরগুলো, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতগুলি ও ধর্মঘট পালন করবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হলেতা মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হবে।
৩. রেল এবং বন্দরগুলি কাজ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি জনগণের দমনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারে এমন এবং সেনাবাহিনীর চলাচলের জন্য রেল অথবা বন্দর ব্যবহার করা হয়, তাহলে রেল-কর্মচারী এবং বন্দর-ঝুঁঝুকরা সহযোগিতা করবে না।
৪. রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রগুলি আমাদের বিবৃতি পূর্ণ বিবরণ দেবে এবং গণআন্দোলনের সংবাদ কিছুই গোপন করবে না। এটা যদি পালন করা না হয়, তাহলে ধরা হবে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত বাঞ্ছিন্নি কোনোরকম সহযোগিতা করছে না।
৫. কেবলমাত্র স্থানীয় এবং আন্তঃজেলার মধ্যে ট্রাঙ্ক, টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে।
৬. সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
৭. স্টেট ব্যাংক বা অন্যকিছুর মাধ্যমে ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠাবে না।
৮. প্রতিদিন সব ভবনের উপরেই কালো পতাকা ওড়ানো হবে।
৯. অন্য সব ক্ষেত্রে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল, কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে যে-কোনো মুহূর্তে পূর্ণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান ঘোষণা করা যেতে পারে।
১০. প্রতিটি ইউনিয়ন, মহল্লা, ধানা, মহকুমা এবং জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে শংগাম পরিষদ সংগঠন করা হবে।

২৭.৭ অসহযোগ আন্দোলন, অন্যান্য দল ও সংগঠনের প্রতিক্রিয়া

Non Co-operation Movement and Reaction of different Organisation

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

১৯৭১ সালের ৮ মার্চ এক সভায় মিলিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদ এই মর্মে প্রস্তাব করে যে: আগামী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরিবর্তে শুধুমাত্র ‘ছাত্রলীগ’ নাম ব্যবহৃত হবে। প্রত্যেক জেলা শহর হতে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত শাখার সভাপতিকে আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদককে সম্পাদক করে এবং ৯ জন সদস্যসহ মোট ১১ জনকে নিয়ে ‘স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করার প্রস্তাব করছে। দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহ পাকিস্তানি পতাকা প্রদর্শন, পকিস্তানি সংগীত বাজানো এবং উর্দু বই প্রদর্শন বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে এবং বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত সিনেমা করও প্রদান না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি

তারা ৯ মার্চ (১৯৭১) এক প্রচারপত্রে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায়।

নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবি আওয়ামী লীগ প্রধান উৎপাদন করেছেন, সেগুলি আদায় করতে পারলে ‘স্বাধীন বাংলা’ কায়েমের সংগ্রামের অগ্রগতির সুবিধা হবে এটি উপলব্ধ করে ঐ দাবিগুলির পিছনে কোটি কোটি জনগণকে সমবেত করা এবং ঐ দাবিগুলি পূরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করা হলো এই মুহূর্তে জরুরি কর্তব্য।

ভাস্তুনীর প্রচারপত্র

ভাস্তুনী ৯ মার্চ ‘পূর্ব পাকিস্তান আজাদী রক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন’ শীর্ষক এক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। এতে বলেন:

‘প্রিয় দেশবাসী, আজ আমি সাতকোটি পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই জরুরী আহ্বান জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, আপনারা দল, মত, ধর্ম ও শ্রেণি নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ একত্রে এবং একযোগে একটি সাধারণ কর্মসূচি গ্রহণ করুন, যার মূল লক্ষ্য হইবে ২৩ বছরের অমানুষিক এবং শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর করাল কবল হইতে পূর্ববাংলা সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।’

ছাত্র ইউনিয়ন

১১ মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন বর্তমানে করণীয় হিসেবে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে:

রাজনৈতিক প্রচার অব্যাহত রাখুন; গ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিন; সর্বত্র সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী গঢ়ে তুলুন; শক্তির মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকুন; যে-কোনোরূপ দাঙা-হাঙামা-উক্ষানি প্রতিরোধ করুন। শান্তি শৃঙ্খলা নিজ উদ্যোগে বজায় রাখুন। এই সংগ্রামের সফলতার জন্য সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামী শক্তির একতা গঠনের জোর আওয়াজ তুলুন।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)

এই দল ৯ মার্চ প্রচার করে যে, পূর্ব বাংলার মুক্তির জন্য শান্তি পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন নয়, হরতাল ধর্মঘট নয়; অন্য হাতে লড়াই করতে, শত শত মানুষের হত্যার বদলা নিতে এবং গ্রামে কৃষকদের গেরিলা লড়াই-এ সংগঠিত করতে আহ্বান জানায়।

ভুট্টোর দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরি

সমগ্র বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতার দাবির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এসময় ১৫ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রদান জুনফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেবার পিওরি ঘোষণা করেন। ভুট্টোর যুক্তি ছিল, পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতিনিধি হিসেবে এই দল তাদের শর্থকে উপেক্ষা করে যেতে পারে না। তিনি পাকিস্তানে 'দুই সরকার দুই প্রধানমন্ত্রী'র দাবি উপাপন করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা এবং ভুট্টোর দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরি পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সমালোচনা করেন।

জামায়াতে ইসলামের ভারপ্রাণ আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ ভুট্টোর প্রস্তাবের সমালোচনা করে বলেন যে, ভুট্টোর প্রস্তাব অবাস্তব এবং তা আইন কাঠামো আদেশের পরিপন্থী। পশ্চিম পাকিস্তান ভেঙে চারটি প্রদেশ সৃষ্টি হলেও তিনি অন্যায়ভাবে এক ইউনিটের কথা বলছেন।

কনভেনশন মুসলিম লীগের আলী আসগর শাহ বলেন যে, ভুট্টো ক্ষমতা পাবার লোডেই কেবল এই পিওরির কথা বলেছেন। অর্থ পাকিস্তান কীভাবে রক্ষা পাবে সেই চেষ্টাই তার করা উচিত ছিল।

এয়ার মার্শাল (অব) আসগর খান শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেবার দাবি জানায়।

পিডিপি নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান শেখ মুজিবের দাবিগুলি ন্যায়সঙ্গত বলে মন্তব্য করেন।

২৭.৮ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা

Direction Announced by Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman

১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঘোষণার মাধ্যমে পূর্বে ঘোষিত এ যাবত কার্যকরি সকল নির্দেশাবলি বাতিল করে দেন। এর পরিবর্তে ১৫ মার্চ থেকে নির্দেশ আকারে ঘোষিত ৩৫টি কার্যসূচি শুরু হবে বলে নির্দেশ দেন।

১৮ নির্দেশ: কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও আধাসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ, হাইকোর্ট ও সমগ্র বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। হরতালের জন্য যে বিশেষ নির্দেশাবলি দেয়া হল তার ব্যাখ্যা নিচে প্রদান করা হলো। হরতালের এই সমস্ত বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দেয়া হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই হরতাল পালন করতে হবে।

২৮ নির্দেশ: বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বঙ্গ থাকবে।

৩৮ নির্দেশ: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা:

ক. ডেপুটি কমিশনার ও সাবডিভিশনাল অফিসারগণ অফিস না খুলে, আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করবে এবং উন্নয়ন কর্মসূচিসহ বর্ণিত নির্দেশাবলি পালন করার জন্য যা করার দরকার সেসব দায়িত্ব পালন করবেন। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করবেন ও পরিষদের সহযোগিতায় কাজ করবেন।

খ. পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজন হলে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহায়তা গ্রহণ করবে।

গ. জেল ওয়ার্ডর ও জেল অফিসসমূহে কাজ চলবে।

ঘ. আনসার বাহিনী তাদের কাজ চালিয়ে যাবে।

৮নং নির্দেশ: বন্দরসমূহ: অভ্যন্তরীণ নৌবন্দর মৌখিয়ান চলাচল অব্যাহত রাখাসহ বন্দর কর্তৃপক্ষ সকল পরিয়েট করে রাখবে। তবে জনগণের উপর নির্যাতন চালানো হতে পারে এমন প্রয়াদি বা সেমানাদিনী মোতাবেকের কাজে সহজেই সম্প্রসারণ ব্যতীত জাহাজসমূহ বন্দরে ভিড় ও বন্দর ছাড়ার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বন্দর কর্তৃপক্ষ অফিসের শধু তেমন বিভাগই চালু থাকবে। সকল জাহাজ বিশেষ করে বাংলাদেশের জনগণের জন্য যে সকল কর্তৃপক্ষ খাদ্যশস্য বহন করে আনছে, সেসব দ্রুত খালাস করতে সার্বিক টেষ্ট অব্যাহত রাখতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের সম

পাওনা ও মাল খালাস চার্জ আদায় করবে। অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহ ও অপরাপর চার্জ আদায় করবে।

৯নং নির্দেশ: মাল আমদানি: আমদানিকৃত সকল মালামাল খালাস করতে হবে আমদানি বিভাগের। সকল শাখাসমূহে করে নেওয়ে নির্দেশ: মাল আমদানি: আমদানিকৃত সকল মালামাল খালাসের অনুমতি দান করবে। গুরুত্বপূর্ণ চালু রাখবে এবং নিরূপিত শর্কের পুরো টাকা জমাদানের ভিত্তিতে মালামাল খালাসের অনুমতি দান করবে। গুরুত্বপূর্ণ ইস্টার্ন ব্যাকিং কর্পোরেশন লিমিটেডে শর্ক কালেক্টরেটে কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ একাউন্টে অর্প জমা দিতে হবে। আওয়ামী লীগ সময় সময় ও সম্পর্ক কালেক্টরেটে আওয়ামী লীগের নির্দেশ মোতাবেক এসব একাউন্ট পরিচালনা করবে। আওয়ামী লীগ সময় সময় ও সম্পর্ক কালেক্টরেটে আওয়ামী লীগের নির্দেশ মোতাবেক এসব একাউন্ট পরিচালনা করবে। আওয়ামী লীগ সময় সময় ও সম্পর্ক কালেক্টরেটে আওয়ামী লীগের নির্দেশ মোতাবেক এসব একাউন্ট পরিচালনা করবে। আওয়ামী লীগ সময় সময় ও সম্পর্ক কালেক্টরেটে আওয়ামী লীগের নির্দেশ মোতাবেক এসব একাউন্ট পরিচালনা করবে।

১০নং নির্দেশ: রেলওয়ে: রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেলওয়ে চালু রাখার জন্য যে যে শাখা খোলা রাখা সরকার দ্বারা অনুমতি দেয় সেই সেই শাখা কাজ করবে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুয়ের উপর নির্যাতন চালানো হতে পারে এমনসব ক্ষেত্রে সেই মোতাবেন বা রসদ পরিবহনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দরসমূহ হতে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে খাদ্য পরিবহনের জন্য মোতাবেন বা রসদ পরিবহনের ওয়াগানসমূহ বরাদ্দ করতে হবে।

১১নং নির্দেশ: সড়ক পরিবহন: বাংলাদেশের সর্বত্র ই.পি.আর.টি.সি চলাচল করবে।

১২নং নির্দেশ: অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন: অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলোর সঠিকভাবে কাজ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় আই.ডব্লিউ.টি.এর স্বল্পসংখ্যক কর্মচারী ই.পি.এস.সি এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কাজ করবে। কিন্তু জনগণের উপর নির্যাতন চালানো হতে পারে এমন সব বাহিনী অথবা সরঞ্জামাদি সমাবেশ করার ব্যাপারে কোনোরূপ সহযোগিতা করা যাবে না।

১৩নং নির্দেশ: ডাক ও টেলিগ্রাফ: বাংলাদেশের মধ্যেই কেবলমাত্র চিঠিপত্র, ডাক, মানির্ডার ও টেলিগ্রাফ প্রাঠানের জন্য ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ কাজ করবে। তবে সকল শ্রেণির বিদেশি মেইল সার্ভিস ও বিদেশি টেলিগ্রাফ সরবারি এই বেশ প্রাঠানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২৫নং নির্দেশে যে সমস্ত বার্তা আদান-প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে ব্যাকেলিস্টের কেবলমাত্র সে ধরনের বার্তা টেলিপ্রিন্টারে আদান প্রদান করতে দেয়ার জন্য সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ১ ঘন্টার জন্য আন্তঃপ্রদেশিক টেলিপ্রিন্টার চ্যানেল খোলা থাকবে। পোস্টাল ব্যাকে ও জীবন বিমা চালু থাকবে।

১০ নং নির্দেশ: টেলিফোন: বাংলাদেশের মধ্যে কেবল স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাইকল টেলিফোন চালু থাকবে। টেলিফোন ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সেকশন চালু থাকবে।

১১ নং নির্দেশ: বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্র: বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসমূহ চালু থাকবে এবং এসব মাধ্যমে জনগণের আন্দোলনের এবং আন্দোলন সংজ্ঞান সকল সংবাদসমূহ পূর্ণ বিবরণসহ প্রচার করতে হবে। অন্যান্য এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরির ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবে না।

১২ নং নির্দেশ: স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সার্ভিসেস: জেলা হাসপাতাল, যম্বা ক্লিনিক ও কলেজ গবেষণা কেন্দ্রসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সার্ভিস চালু থাকবে। সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর্স চালু থাকবে এবং সকল হাসপাতাল, মফস্বল শহরের ঔষধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৩ নং নির্দেশ: বিজলী সরবরাহ: মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজের সাথে সম্পর্কিত ইপি ওয়াপদার সমস্ত বিভাগ কাজ করবে।

১৪ নং নির্দেশ: পানি ও গ্যাস: পানি ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা চালু থাকবে এবং সাথে সম্পর্কিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

১৫ নং নির্দেশ: কয়লা সরবরাহ: ইট ভাটা ও অন্যান্য কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

১৬ নং নির্দেশ: খাদ্য সরবরাহ: সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা আন্দানি, বন্টন, শুদ্ধাম্বাতকরণ ও স্থানান্তরের চালান অব্যাহত থাকবে। একাজের জন্য ওয়াগান, বার্জ, ট্রাক ইত্যাদিসহ সবরকমের যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৭ নং নির্দেশ: কৃষি কাজের তৎপরতা: ক. ধান ও পাটের বীজ, সার এবং কীটনাশক ঔষধ সংগ্রহ, চলাচল এবং বন্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার, চাল গবেষণা ইনসিটিউট এবং এগুলোর সকল প্রকল্পের কাজ চলবে। খ. পাওয়ার পাস্প এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের চলাচল, বন্টন, স্থাপন এবং চালানের কাজ চলবে। এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় তেল, ছালানি, যন্ত্রপাতি, সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাও রাখতে হবে। গ. নলকূপ খনন, পরিচালনা এবং খালের সেচসহ সব রকম পানিসেচ ব্যবস্থা চালু থাকবে। ঘ. বাংলাদেশে সমবায় ব্যাংক, সেন্ট্রাল সমবায় ব্যাংক ও এদের অনুমোদিত সংস্থা, থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সব সমবায় প্রতিষ্ঠান চালু থাকবে। ঙ. এতদুদ্দেশ্যে ই.পি.ডি.সি.র প্রয়োজনীয় সেকশন চালু থাকতে পারে। চ. কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকাসমূহ সুদুর্মুক্ত ঝণ প্রদান অব্যাহত থাকবে। ছ. শুদ্ধাম্ব রাখার উদ্দেশ্যে গোল আলু কেনার জন্য এডিবিপি দ্রুত অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

১৮ নং নির্দেশ: বন্য নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ: বন্য নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ইপি ওয়াপদা ও অন্যান্য সংস্থার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও চলাচল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জরুরি কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারি সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা স্বাভাবিক নিয়মে কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।

১৯ নং নির্দেশ: উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ: বৈদেশিক সাহায্যে নির্মিত সড়ক ও সেতু প্রকল্পসহ স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা ও আধা-সরকারি সংস্থার সব উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন সুচারুরূপে চলবে। সরকারি সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা যথায়ীতি কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সব উপকরণ সরবরাহের নিয়মাবলী বিধান করবে।

২০ নং নির্দেশ: সাহায্য ও পুনর্বাসন: ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকার বাঁধ নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজসহ সব রকম সাহায্য ও পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা যথায়ীতি মিটিয়ে দিবে।

২১ নং নির্দেশ: ই.পি.আই.ডি.সি, ইপসিক কারখানা ও ইস্টার্ন রিফাইনারী: ই.পি.আই.ডি.সি ও ইপসিকের সব কারখানায় কাজ চলবে এবং যত-বেশি সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করবে। এসব কারখানা চালু রাখার জন্য অর্থ সরবরাহ ও জরুরী জন্য ই.পি.আই.ডি.সি, ইপসিকের বিভাগ খোলা দরকার হবে সেগুলোতে কাজ চলবে। ইস্টার্ন রিফাইনারী নিয়মিতে যথায়ীতি কাজ চলবে।

২২নং নির্দেশ: বেতন দান: সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার কর্মচারি ও শ্রমিক এবং প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের মেজে তো তাদের পাওনা হলে সেভাবেই দিতে হবে। যে সব সরকারি কর্মচারির বন্যা সাহায্য মন্ত্র করা হয়েছে এবং যদ্যপি বেতন রয়েছে তা দিতে হবে। বেতনের বিল তৈরি ও বেতন দানের জন্য সরকারি ও আধা-সরকারি অফিসের সর্বো বিভাগগুলোতে কাজ চলবে।

২৩নং নির্দেশ: পেনশন: সামরিক বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদেরসহ সব পেনশনপ্রাপ্তদের নির্ধারিত তারিখে পেনশন দিয়ে হবে।

২৪নং নির্দেশ: (একাউন্টেন্টস জেনারেল অব ইস্ট পাকিস্তান) ইজিইপি ও ট্রেজারী: বেতনের দিল তৈরি এবং এসব নির্ধারণ অনুমোদিত লেনদেনের জন্য এজিইপি ও ট্রেজারীতে সামান্য সংখ্যক কর্মচারি কাজ চালিয়ে যাবে।

২৫নং নির্দেশ: ব্যাংক: ক. ব্যাংকিং কাজের জন্য সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য বিকেল ৪টা পর্যন্ত (বিরতির সময়সহ) সব ব্যাংক খোলা থাকবে। তবে উক্তবার ও শনিবার দিন ব্যাংকিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য দুপুর ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমতিপ্রাপ্ত লেনদেনের জন্য বুক ব্যালেন্সিং ও সব স্বাভাবিক কাজ নিয়মিতভাবে চলবে।

ঝ. নিম্নলিখিত বিধি-নিষেধ ছাড়া ব্যাংকগুলো যেকোনো পরিমাণ জমা গ্রহণ, বাংলাদেশের ভেতর বেঙ্গলে পর্যবেক্ষণ আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারেন্স, বাংলাদেশের ভেতর আন্তঃব্যাংক ট্রান্সফার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টিটি বা মেল ট্রান্সফারে ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ দ্রু করার কাজ চালিয়ে যাবে।

বিধি-নিষেধগুলো হচ্ছে:

১. চেকের সাথে যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধি বা বেতন রেজিস্টারের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে বেতন বা অর্থ পরিশোধ করা।
২. সপ্তাহে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাফাইড ব্যক্তিগত ড্রাইংস।
৩. চিনিকল, পাটকল ইত্যাদির জন্য আখ ও পাটসহ শিল্পের জন্য কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য অর্থদান।
৪. বাংলাদেশের ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়সহ যেকোনো বোনাফাইড প্রয়োজনে সপ্তাহে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান। এই অর্থ নগদ অর্থে বা ক্যাশ ড্রাফট মারফত উঠানো যাবে। তবে উপরে উল্লেখিত ৩ ও ৪নং শর্তে কোনো অর্থ দেয়ার পূর্বে অতীত রেকর্ড দেখে ব্যাংকগুলোকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, অর্থ গ্রহণকারী একজন বেন্দুকের শিল্প অথবা বাণিজ্যিক সংস্থা বা ব্যবসায়ী এবং যে পরিমাণ অর্থ উঠানো হচ্ছে তা গত এক বছরে সপ্তাহে গড়ে উল্লেখ অর্থের চেয়ে বেশি নয়।
৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নিযুক্ত তালিকাভুক্ত কন্ট্রাক্টরদের অর্থ দান। তবে যে কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কাছ থেকে চেকে একটি সার্টিফিকেট আনতে হবে যে, যে টাকা উঠানো হচ্ছে তা উল্লেখিত কাজের জন্য প্রয়োজন।
৬. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেকোন ক্রস চেক বা ডিমাও ড্রাফট যেকোন একাউন্টস থেকে আদান-প্রদান করা যাবে।
৭. স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চিঠি পাঠাতে পারবে। যেকোন ব্যাংকের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সেগুলো ঢাকাস্থ স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রয়োজনীয় পাওনা গ্রহণ করবে।
৮. অর্থ সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য সোমবার হতে বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত আন্তঃ টেলিপ্রিস্টার সার্ভিস চালু থাকবে।

১. প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক সোমবার ও বুধবার বিকাল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি খনর পাঠাতে পারে।
২. প্রত্যেকটি ব্যাংক অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে খনর পেতে পারে।
৩. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাংক পদ্ধতির জন্য টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসের কাজ অব্যাহত থাকবে।
৪. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিল সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রস বা ক্রস ড্রাফটস এর মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করতে হবে।
৫. অনুমোদিত ডিলারের মাধ্যমে ফরেন ট্রাভেলার্স চেক ভাসানো যাবে।
৬. কৃটনীতিকরা অবাধে তাদের একাউন্টের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন এবং বিদেশি নাগরিকরা তাদের বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টস পরিচালনা করতে পারবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন।
৭. লকার্স পরিচালনার কাজ বন্ধ থাকবে।
৮. স্টেটস ব্যাংকের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশ থেকে বাইরে কোনো টাকা পাঠানো যাবে না।
৯. বিদেশি রাষ্ট্র হতে লাইসেন্সের মাধ্যমে মালামাল আমদানির জন্য ঝণপত্র খোলা যাবে।
১০. পণ্য বিনিয় চুক্তি অনুযায়ী প্রেরিত মালামাল ছাড় করতে হবে।
১১. ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এবং ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন মারফত বকেয়া রঞ্জানি বিল সংগ্রহ করতে হবে। এ ব্যাপারে ব্যাংকগুলোর প্রতি প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ পরিচালিত হবে।

২৬৮ নির্দেশ: স্টেট ব্যাংক: স্টেট ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলোর মতোই কাজ করবে এবং সেখানেও একই অফিস সময় চলবে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং পদ্ধতি কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনুরূপ খোলা থাকবে। উল্লেখিত বিধি-নিবেদ এবং সময় ও লেনদেন পদ্ধতিও চালু থাকবে। ‘পি; ফরম’ বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্য বিদেশে প্রেরণের জন্য টাকাও গৃহীত হতে পারবে।

২৭৯ নির্দেশ: আমদানি ও রঞ্জানি কন্ট্রোলার: বাংলাদেশের জন্য আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরণ এবং আমদানিকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধিব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি-রঞ্জানি কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিত চলবে।

২৮০ নির্দেশ: ট্রাভেল এজেন্ট ও বিদেশি এয়ার লাইস: সমস্ত ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশি এয়ার লাইস পরিবহন অফিস চালু থাকবে। তবে তাদের বিক্রয়লক্ষ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

২৯১ নির্দেশ: ফায়ার সার্ভিস: বাংলাদেশের সব অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩০২ নির্দেশ: পৌরসভা: পৌরসভা, মালবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি জ্বালানো এবং সুইপার সার্ভিসসহ অন্যান্য জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১৩ নির্দেশ: (১) করদান বন্ধ রাখা অভিযান: ৩১ (ক) পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ৩১(ক) (১) সব ভূমি রাজ্য আদায় বন্ধ থাকবে ৩১ (ক) (২) বাংলাদেশের কোথাও কোনো লবণ কর আদায় করা যাবে না ৩১ (ক) (৩) বাংলাদেশের কোথাও কোনো তামাক কর আদায় করা যাবে না ৩১(ক) (৪) তাঁতীরা আবগারি শুল্ক ছাড়াই বাংলার সুতা কিনবেন। মিল যানিক ও ডিলাররা তাদের কাছ থেকে কোনো আবগারি শুল্ক আদায় করতে পারবে না।

৩১ (খ) এছাড়া প্রাদেশিক সরকারের সব কর- যেমন প্রয়োদকর, হাট-বাজার, সেতু ও পুকুরের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের খাতে জমা দেয়া যাবে।

৩১ (গ) আয়করসহ সব স্থানীয় কর আদায় করা যাবে।

৩১ (ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের সব পরোক্ষ কর- যেমন আবগারি শুল্ক বিক্রয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায় হবে তবে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে হস্তান্তর করা যাবে না বা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে জমা দেয়া যাবে না, এসব আদায়কৃত কর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক বা ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনে বিশেষ হিসাব খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাংক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ এবং সময় সময় যে নির্দেশ দেয়া হবে তা মানতে হবে।

৩১ (ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের সব প্রত্যক্ষ কর, যেমন আয়কর ও অন্যান্য কর পরিবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ পাকবে।

৩২নং নির্দেশ: পাকিস্তান বিমা কর্পোরেশন চালু থাকবে এবং পোস্টাল লাইন ইন্ড্রেপেন্সহ সব বিমা কোম্পানিতে কান্ত চলবে।

৩৩নং নির্দেশ: সব ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দোকানপাট নিয়মিতভাবে চলবে।

৩৪মং নির্দেশ: সব বাড়ির সামনে এবং উপরে কালো পতাকা উড়ানো অব্যাহত থাকবে।

৩৫নং নির্দেশ: সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এসব নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে থাবে।

২৭.৯ শেখ মুজিব, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর বৈঠক

Meeting among Sheikh Mujib, Yahia and Bhutto

১৫ মার্চ কয়েকজন জেনারেলসহ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমরোতা করা। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক করেন। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকা আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। এ সময় একটি পূর্ণ শাসনতন্ত্র রচনার চেয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়েই বেশি আলোচনা করে তারা। ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে আপস মীমাংসা করতে ব্যর্থ হন। তিনি ভুট্টোর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন বলে মনে করেননি। কেননা তখন পাঞ্জাবে ভুট্টোর ব্যাপক জনসমর্থন ছিল। এছাড়া পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য পাঞ্জাব থেকে আগত ছিল। পাঞ্জাবিরা ৬ দফার বাস্তবায়নে সম্মত ছিল না। আওয়ামী লীগ ও ৬ দফার প্রশ্নে কোনো ছাড় দিতে রাজি নয়। এদিকে ঢাকায় ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এমতাবস্থায় ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান সংকটের সামরিক সমাধান দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। তারা আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করে আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনা-সদস্য ও সামরিক সরঞ্জামাদি আনতে থাকে। এনিয়ে মওদুদ আহমেদ বলেন,

ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে যে সমরোতাই হটক না কেন, বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী তাদের সব রকম যুদ্ধোপকরণ সজ্জিত করে যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করে নেয়। অন্তর্শান্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে এমভি সোয়াত নামের জাহাজ তরা মার্চ থেকেই চট্টগ্রামে নোঙরের অপেক্ষায় বঙ্গোপসাগরে অপেক্ষা করছিল। পিআইএ বিমানযোগে আরো ঘন ঘন ফ্লাইট-এ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেসামরিক পোশাকে সৈন্য আমদানি করা হচ্ছিল। সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ বহনকারী সি-১৩০৬ বিমানগুলো অবতরণ করছিল ঢাকা বিমানবন্দরে। স্ট্রাটেজিক পয়েন্টগুলোতে বসানো হয়েছিল ভারী কামান ও মেশিনগান। পাকিস্তানের সুকোশলী এসএমজি কমাণ্ডো ফ্রপের ঢাকা তথ্যও ঢাকার সাংবাদিকের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছিল। মুজিব এবং ইয়াহিয়া যেখানে দেনদরবার ঢালাচ্ছিলেন সেই গণভবনের ভেতরে ও বাইরে মোতায়েন করা হচ্ছিল ট্যাক্সি বহর। অন্যদিকে যত্রত্র জনতার উপর সেনাবাহিনীর শুলিবর্ষণ এবং বাঙালি-অবাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাপ্ত পরিস্থিতিকে নিয়ে যাচ্ছিল আরো অবনতির দিকে।

২.১০ অপারেশন সার্চলাইট

Operation Searchlight

অপারেশন সার্চলাইট বা ২৫ মার্চের কালোরাত বাঙালির মৃত্যি সংঘাতের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মুজিব ইয়াহিয়া বৈঠকের নামে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কালক্ষেপনের কৌশল নেয়। আর এই সুযোগে তারা যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। অবশ্যেই ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বেই তিনি নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঘাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে যান। জেনারেল টিক্কা খান, লে. জে. খাদিম হোসেন ও রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চলাইটের নিল নকশা প্রণয়ন করেন।

অপারেশন সার্চলাইট এর মূল পরিকল্পনা

অপারেশন সার্চলাইট অভিযান উরুর নির্ধারিত সময় ছিল ২৬ মার্চ রাত ১টা। কিন্তু বাঙালি বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ সূচির আগেই পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পৌছার লক্ষ্যে অভিযান এগিয়ে ২৫ মার্চ রাত ১১:৩০ মিনিটে নির্ধারণ করে। পাকিস্তানি বাহিনীর ১৪ ডিসেম্বরে জিওসি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি অপারেশন সার্চলাইট নামে একটি সামরিক অভিযানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। ১৭ মার্চ চিফ অব স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদ খানের নির্দেশে জেনারেল রাও পরদিন ঢাকা সেনানিবাসে জিওসি অফিসে অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। ৫ পৃষ্ঠার এই পরিকল্পনাটি রাও ফরমান আলী নিজ হাতে লেখেন। লে. জেনারেল টিক্কা খান ৩১ ফিল্ড কমাণ্ডে উপস্থিত হয়ে নিজেই অপারেশনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া এ অভিযানকে সফল করার জন্য ইতোমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দুজন ঘনিষ্ঠ অফিসার মেজর জেনারেল ইবতেরার জানজুয়া ও মেজর জেনারেল এ ও মিঠাকে ঢাকায় আনা হয়। অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় নিম্নোক্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

১. একযোগে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অপারেশন উৎকৃষ্ট হবে।
২. সর্বাধিক সংখ্যক রাজনৈতিক, ছাত্রনেতা, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক কর্মীকে ঘ্রেফতার করতে হবে।
৩. ঢাকার অপারেশনকে শতভাগ সফল করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করতে হবে।
৪. সেনানিবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যমকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।
৬. ইপিআর সৈনিকদের নিরস্ত্র করে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈনিকদের অস্ত্রাগার পাহারায় নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের হাতে অস্ত্রাগারের কর্তৃত্ব দিতে হবে।
৭. প্রথম পর্যায়ে এ অপারেশনের এলাকা হিসাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর ও সিলেটকে চিহ্নিত করা হয়। প্রয়োজনে দূরবর্তী স্থানে বিমানযোগে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

অপারেশন সার্চলাইটে ঢাকা শহরে কর্তৃত প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়।

১. পিলখানায় অবস্থিত ২২ নং বেলুচ রেজিমেন্ট ৫,০০০ বাঙালি ইপিআর সেনাকে নিরস্ত্র করবে এবং তাদের বেতার কেন্দ্র দখল করবে।
২. গাজীরবাগ পুলিশ লাইনে ৩২ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ১,০০০ বাঙালি পুলিশকে নিরস্ত্র করবে।
৩. ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট শহরের হিন্দু অধ্যুষিত নবাবপুর ও পুরনো ঢাকায় আক্রমণ চালাবে।

৪. ১২ মধ্যে ১৮, ১৮ ও ৩০ মধ্যে পাঞ্চাল সেক্ষনের কাছাটি করা একদল সৈন্য আওয়ামী সৈন্যের শক্তি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইচ্ছাপত্র হল (ভঙ্গুর হল ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ হল) আচরণ করবে।
৫. বিশেষ সার্ভিস ঘৰপের এক প্রাচীন কর্মসূচি শেখ বুজুর রহস্যের বাঢ়ি আচরণ ও তাকে প্রেক্ষার করবে।
৬. মিস্ট রেজিমেন্ট হিন্দীর রাজনীতি ও সম্প্রচার বর্ষাত (মোহাম্মদপুর-বিরপুর) নিয়ন্ত্রণ করবে।
৭. শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং ২৪ ট্যাক্সের একটি ছোট স্কেলেন আপেই রাস্তার নামে এবং প্রয়োজন সোনা কর্তৃপক্ষ করবে।
৮. উপরোক্ত সৈন্যরা রাস্তায় দেশেন প্রতিকোন দক্ষতা করবে এবং ভালিকাতুঙ্গ রাজনীতিবিদদের বাড়িতে অভিযান চালাবে।

অপারেশন সার্ভিসের আওতার গুণহৃত্যা

ইয়াদীয়ার নির্দেশে টিক্কা পাদের সাতক সৈন্যরা ২৫ মার্চ রাত সন্তু এগারটার দিকে ট্যাক, মেশিনগান, বর্তা ও অন্যান্য অস্থায়ে সজিত ঘরে নিরুৎস ও নিয়োগ কার্ডলিসের উপর বাধিতে পড়ে। তাদের প্রথম আচরণের শিক্ষা হল কর্মসূচি এলাকায় মিছিমাত্র বাড়পিয়া। একই সাথে তারা আচরণ চালাত রাজুরবাস পুলিশ জাইল এবং পিলবাল হাস্পাতাল হেডকোয়ার্টারে। নিষ্ঠুর আচরণ ও গুণহৃত্যার বরু বাতে প্রতিকোন প্রচাশ না হতে পারে এই ভল্য দৈনিক ইকোব, সৈনিক সংস্কার, সৈনিক বালো, টেক্সেলি পিপলস পাইকল অফিস আলু দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হব। সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের মুঝে দুঃস্মৃত হত্যা করা হয়।

আছাড়া চাকার বিভিন্ন ধ্যানাদান, তাঁতীবাজার, শাবারিপাটি, ইন্দিরাবোড়, বিরপুর, মোহাম্মদপুর, রাবেরবাজার, বনমতি, কাঠাপদবাগান প্রভৃতি হাজে গুণহৃত্যা চালায়। উত্তিকুর পরিষিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাক সৈন্যরা দোকানপাট, বুরবাড়ি, বিল্ল পত্রিকা অফিস পেট্রোপ পাস্প ও অন্যান্য বাস্তিতে আলু লাগিয়ে দেয়। তাদের এই গুণহৃত্যার বরু বাতে দেশের বইও ছাড়িয়ে না পড়ে সৈন্য চাকায় ইন্টারলিন্টেল হেটেলে (হোটেল রূপসী বালো) ২৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে বন্দ করে রাখা হয়।

পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫ মার্চ পরিচালিত এই গুণহৃত্যার নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সার্ভিস’। এই বাতে চাকাতেই প্রয় ৫ ঘণ্টার নিরীক্ষা মানুষকে হত্যা করা হয়। একাইপে ২৫ মার্চ বাড়ালির জাতীয় ইতিহাসে কালো বাতি নামে পরিচিত।



ইউনিট

৩৪

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা The Role of Super Power in the Liberation War

মোঃ জিয়াউর রহমান^১

পূর্বের আলোচনাগুলো থেকে ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন ও শোবদের পর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে এবং সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বিশ্বের মানচিত্রে পাকিস্তান ছিল একটি অস্ত্র রাষ্ট্র, যার নজির বিরল। স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের মূল ভূখণ্ডে দারা বিচ্ছিন্ন প্রায় হাজার মাইলেরও অধিক দূরত্বে অবিস্তৃত দুটি ভূখণ্ডে নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একমাত্র ধর্ম ছাড়া প্রায় সব দিক থেকেই দুই অংশের মধ্যে ছিল বিস্তর অমিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেখা দেয় সংহতির সংকট যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং মাত্র ২৩ বছরের মধ্যেই এ রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে জারগা করে নেয় আরেকটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ যার নাম হয় বাংলাদেশ।

৩৪.১ বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা

The Role of Super Powers

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ বাংলাদেশ। মাত্র নয়মাসের যুদ্ধের মাধ্যমেই অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। কিন্তু এই স্বল্পসময়ে এদেশে যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে তা বিশ্বের যেকোনো যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল। পাকিস্তান বাহিনী ও তার দোসররা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের এই অমানবিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ও বাঙালির পক্ষে বা বিপক্ষে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে কারো ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। কারো ভূমিকা ন্যাকারজনক ছিল। রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অপরাপর রাষ্ট্র থেকে বিশ্বের যে রাষ্ট্রগুলো অগ্রগামী এবং বিশ্বের ঘটনাবলীর উপর যাদের কর্তৃত বজায় থাকে বৃহৎ শক্তি বলতে সেই রাষ্ট্রগুলোকেই বুঝায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তি ও বহির্বিশ্বের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। বিশেষত তৎকালীন দুই প্রাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং উদীয়মান হিসেবে বিবেচিত দুই শক্তি ভারত ও চীনের ভূমিকা এদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষ আলোচনার বিষয়। মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ধ্রুক্ষভাবে বাংলাদেশের সহায়তাকারী। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষশক্তি ও বিরুদ্ধাচারী। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সংঘোস, সিনেট ও সর্বস্তরের জনগণ এবং চীনা জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল অপরিসীম। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দুই প্রাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ বিরাজমান ছিল। দুই বৃহৎ সাম্যবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল চীন। এমনি এক প্রেক্ষাপটে ২৬ মার্চ, ১৯৭১ শর্ক হয়েছিল

^১ প্রতিবেদক, ইতিহাস বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। বিশ্বের ছোট বড় অনেক দেশই এ যুদ্ধের সাথে মানবতাবে জড়িয়ে পড়েছিল। সেসব দেশের মীঠি ও ফার্মালী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গতিখনাতকে অভ্যন্তরীণ একাবিত করেছিল। স্নায়ুদের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বৈশ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল বিদ্যায় বাংলাদেশের সমর্থন বা বিরোধিতার পেছনে ছিল প্রত্যেক শক্তিরই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাব। অর্গান কোনো শক্তিরই কেবল আদর্শগত কারণ বা মানবিক কারণে পক্ষান্তরদল করেনি। তবে সাধারণভাবে মুসলিম অধ্যয়িত রাষ্ট্রগুলো সমর্থন করেছিল তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে। আর ইউরোপীয় দেশগুলো কমবেশি সমর্থন দেওয়ায়েহে বাংলাদেশকে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ। ২৩ বছর পাকিস্তান-রাষ্ট্রের কল্প থেকে ১৯৭১ সালে মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করতে হয় বাংলাদেশকে। মাঝে নয় মাসের যুদ্ধের মাধ্যমেই অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিসমূহের কীরূপ ভূমিকা ছিল তাই এ অংশের মূল আলোচনার বিষয়।

৩৪.২ বৃহৎ শক্তি কারা?

Who were the Super Power

মূলত বৃহৎ শক্তি বলতে তাদেরকেই বুঝায় যারা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অপরাপর রাষ্ট্র থেকে অগ্রগামী এবং বিশ্বের ঘটনাবলীর উপর যাদের কৃত্তৃ বজায় থাকে। তৎকালীন সময়ে বৃহৎশক্তি বলতে মূলত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলা যায়। তবে এসময়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের আদর্শগত দ্বন্দ্বের পরিণতিতে পারস্পরিক সম্পর্কের চরম অবনিত ঘটে এবং বিশ্বে তৃতীয় শক্তি হিসেবে চীনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

৩৪.৩ সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি

World Situation of the Then Period

১৯৭১ সালে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল একটু ভিন্নতর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকান্তির পরিবর্তিত নতুন বিশ্বে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য সমাজতাত্ত্বিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্বের অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্র একটি জোট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ আলাদা জোট বেঁধেছিল। দুই জোট ছিল পরস্পর ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী এবং তাদের নিরসন প্রচেষ্টা ছিল ক্রমায়ে নিজেদের জোটের সম্প্রসারণ। ফলে এদের একটি যদি কোনো রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করতো তাহলে অপর জোটটি সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রংখে দাঁড়াতো। তাহাড়া আন্তর্জাতিক কূটনীতিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দুই পরাশক্তির একটি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানায়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। সেসময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ অনেক রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সমর্থন দেয় কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক চীন এ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে।

৩৪.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, United States of America

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ফলে সৃষ্টি জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ছিল এক ধরনের বিভ্রান্মূলক ঘটনা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের তিক্ত অভিভূতার আলোকে সবেমাত্র পরবর্তনীতি বিশেষ করে এশীয় নীতি চেলে সাজানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। এমনি পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করে তা ছিল বাণিজ্য স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থ। মুক্তিযুদ্ধের পুরো মুখ্য মাস নিম্নলিখিত প্রশাসন পাকিস্তানের জন্য নৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন যুগিয়েছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ জনমত ছিল সর্বদা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যায়।

১. সংবাদ মাধ্যম

Media

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'ক্রিচিয়ান সায়েন্স মনিটর' প্রভৃতি সংবাদপত্র বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই 'নিউইয়র্ক টাইমস' মতব্য করেছিল, "এই গৃহযুদ্ধ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হলেও গেরিলা যুদ্ধের রূপ পরিষ্ঠিত করলে বিপদজনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বাস্ত্রবর্গের উচিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আহবান জানানো যেন মানবতা ও শুভবুদ্ধির ভিত্তিতে তিনি রক্তপাত বন্ধ করেন এবং জনগণের নির্বাচিত নেতৃ শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন।" 'ওয়াশিংটন পোস্ট' এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বদেশের নির্বাচিত নেতৃ শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন। এসময়ের মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের বক্তব্য বিবৃতি বিচার করে বলা যায় যে, নাগরিক হত্যার জন্য ইয়াহিয়াকে দায়ী করে। এসময়ের মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের বক্তব্য বিবৃতি বিচার করে বলা যায় যে, তারা মূলত মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি সত্ত্বেজনক রাজনৈতিক সমাধানের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিল, কিন্তু তারা প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি।

২. বুদ্ধিজীবী

Intellectuals

তৎকালীন মার্কিন বুদ্ধিজীবীগণ একটি সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। শিক্ষাপ্রনে মার্কিন পক্ষের মধ্যে পাকিস্তানের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। ১৯৭১ সালের ২২ এপ্রিল International Committee on University Emergency (ICUE) নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ১০০-এর বেশি বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি প্রকাশ করে। এতে বাংলাদেশে শিক্ষক-ছাত্রসহ গণহত্যার নিন্দা করা হয়। Association for Asian Studies এর বার্ষিক সম্মেলনে প্রায় ২০০০ শিক্ষাবিদ অবিলম্বে গণহত্যা বক্তব্যের দাবি জানান। এ সম্মেলনে জরুরী আগস্মাত্ত্ব পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে অনুরোধ জানানো হয়। এডওয়ার্ড ম্যাসন, রবার্ট ডর্ফম্যান ও স্টিফেন মার্গোলিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইয়াহিয়া চত্রের দমননীতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অনেকটাই অবধারিত। তাঁরা আরও বলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কোনোটা মই দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থের প্রতিকূল হবে না। উপরন্তু ৩০ জনের মত বুদ্ধিজীবী দলবদ্ধভাবে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সংস্কৃত দাবিকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উপেক্ষা করার কোনো অধিকার পাকিস্তানের নেই।

৩. রাজনীতিবিদ

Politicians

মার্কিন রাজনীতিবিদ বিশেষ করে কয়েকজন সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্য সরকারি নির্বিষ্টতার কঠোর সমালোচনা করেন। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি মার্কিন সরকারকে শাস্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সক্রিয় হতে বলেছিলেন। কানুন মার্কিন অঙ্গের মাধ্যমেই গণহত্যা চলছিল। এসময় দশজন সিনেটর অন্তিভিলম্বে পাকিস্তানের জন্য আর্থিক ও সামরিক দ্রুতাবাস কর্মচারীগণ নিখ্রন প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বা পাকিস্তান ঘেঁষা নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এমনকি ঢাকায় নিযুক্ত কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ১৯ জন কৃটনীতিবিদের স্বাক্ষরসহ ওয়াশিংটনে পরবর্ত্তী দণ্ডরকে একটি কড়া চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে বলা হয়েছিল অনুসৃত নীতির ফলে ব্যাপক অর্থেনেতিক স্বার্থ বা সীমিত অর্থে জাতীয় স্বার্থ কোনোটি উদ্বার করা সম্ভব হচ্ছে না। পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিখ্রনের নির্দেশে তাঁকে ঢাকা থেকে অপসারণ করা হয়।

৪. বিভিন্ন সংস্থা

Different Organisation

এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ বন্ধু সমিতি নামে বিভিন্ন সমিতি গড়ে উঠে এবং এসব সমিতির সদস্যরা চিঠি লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, সংবাদ সম্মেলন করে এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে তদবির করেন এবং জনমত সৃষ্টি করেন। এছাড়া তাঁরা চাঁদা সংগ্রহ করে আগ কার্যক্রমে সহায়তা করে। এই ধরনের কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত কনসার্ট ফর বাংলাদেশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পণ্ডিত রবিশংকর, বিটলস্ ম্যানেজার এলেন ক্লাইন ও জর্জ হ্যারিসনের উদ্যোগে ১ আগস্ট, ১৯৭১ এ বিখ্যাত কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চাল্লিশ হাজার শ্রোতা এতে উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত সমুদয় অর্থ বাঙালি শরণার্থীদের জন্য ব্যয় করা হয়। ১৯৭১ এর প্রেক্ষাপটে এমন একটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ছিল অনেক। এর ফলে সমগ্র আমেরিকায় বাংলাদেশের পক্ষে অনুকূল মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে।

৩৪.৫ মার্কিন সরকারের নীতি

US Government Policy

মার্কিন সাধারণ জনগণ বুদ্ধিজীবী সংবাদ মাধ্যম শুরু থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলেও ব্যতিক্রম ছিল মার্কিন সরকারের ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্ব থেকেই মার্কিন নীতি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান দেশে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকারের পাকিস্তান প্রীতি ছিল সর্বজনস্বীকৃত। মূলত ৫০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ছিল পাকিস্তানের প্রধান অন্তর্বর্তী সরবরাহকারী। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের শহর ও গ্রামাঞ্চলের সর্বত্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা বিমান, ট্যাংক, অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এই ধারা প্রায় অব্যাহত ছিল। সে সময় সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য পাকিস্তানে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ রাখতে মার্কিন প্রশাসনকে বাধ্য করেছিল। নাবিক ও সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের মুখেই অস্ত্র বোঝাই জাহাজ বন্দরে অবরোধ করে রাখা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বেই ৬ মার্চ ১৯৭১ কিসিঞ্চার নীতি নির্ধারণ সংস্থা সিনিয়র রিডিউ এফ-এর সভা আহবান করেন। এ সভায় আওয়ার সেক্রেটারি এ.জনসন মত প্রকাশ করেন যে, অর্থও পাকিস্তানের অব্যাহত অঞ্চলের

যুদ্ধামেই দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলা, মার্কিন ও ভারতীয় স্বার্থ নিরাপদ থাকবে। ৭ এপ্রিল, ১৯৭১ প্রথম সরকারি ঘোষণায় নিয়ন্ত্রণ প্রশাসন সমস্যাটিক রাজনৈতিক সমাধানের আহনান জানান। এর পরদিন অর্থাৎ ৮ এপ্রিল, ১৯৭১ পরবর্তী দণ্ডের এগিপ্টেট সেক্রেটারি জোসেফ গিসকে সমস্যাটিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে অভিহিত করেন।

জনগণের প্রবল চাপে নিয়ন্ত্রণ প্রশাসন যুথে শাস্তিপূর্ণ সমাধান এবং অন্ত সরবরাহ বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু মার্কিন গবর্নেম মাধ্যম অভিযোগ করে যে, অন্ত সরবরাহ বন্ধ রাখার কথা থাকলেও পাকিস্তানে প্রচুর মার্কিন অস্ত্র যাচ্ছে। তবন পরবর্তী দণ্ডের ব্যাখ্যা দেয় যে, সরবরাহকৃত অঞ্চের চুক্তি ২৫ মার্চের পূর্বেই করা হয়েছিল। তবে পরিস্থিতি ছিল তিনি। মুক্তিযুক্তকালীন মার্কিন প্রশাসন পরোক্ষভাবে পাকিস্তানে সমরাজ্ঞ সরবরাহ করে। যেমন অঞ্চের সৌন্দিরি আরব হয়ে ৭৪ টি মার্কিন জাতী বিমান যায় পাকিস্তানে। পরবর্তী সময়ে রশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর হলে নিয়ন্ত্রণ-কিসিঙ্গার (পরবর্তীমন্ত্রী) জুটি পাকিস্তানের প্রতি আরও ঝুঁকে পড়েন। এ চুক্তিকে হেনরী কিসিঙ্গার বার্তাদের স্তরে জুলান্ত শালাকা নিক্ষেপের সঙ্গে তুলনা করেন।

আগস্ট মাসে ওয়াশিংটন রাজনৈতিক সমাধানের জন্য মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। প্রাথমিকভাবে কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা জানান যে, এ ধরনের আলোচনা হতে পারে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। কাজেই উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়।

১৯৭১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে নিয়ন্ত্রণ প্রশাসন যুদ্ধ এড়ানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় এমনকি এসময় ভারতের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য ৮৬.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়। তাহাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে বারবার যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব উত্থাপন করে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেট্টো দানের কারণে তা ব্যর্থ হয়। এভাবে যুদ্ধ বন্দের সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখন ভিয়েতনামের টৎকিল উপসাগরে অবস্থানরত সপ্তম নৌবহরের কয়েকটি জাহাজ সমন্বয়ে “টাক্ষফোর্স-৭৪” গঠন করা হয়। সম্পূর্ণ টাক্ষফোর্সটি পারমাণবিক অন্তে সজ্জিত ছিল এবং নেতৃত্বান্বকারী জাহাজটির নাম ছিল ‘এন্টারপ্রাইজ’ ১২ ডিসেম্বর টাক্ষফোর্সটিকে বঙ্গোপসাগর অভিযুক্ত যাত্রা করার নির্দেশ দেয়া হয়, কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যেই সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়। নতুন নির্দেশ অনুসারে টাক্ষফোর্স ১৪ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে পৌছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ বিরোধী মার্কিন নীতি ছিল নিতান্তই হোয়াইট হাউসের অর্থাৎ স্বেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ, কিসিঙ্গারের ব্যক্তিগত নীতি। মার্কিন জনমত প্রবলভাবে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাদের কারণে বাংলাদেশ সংকট আন্তর্জাতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই বলা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক ভূমিকা ছিল।

৩৪.৬ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা The Role of Soviet Union

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে আরেক বৃহৎ শক্তি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। বৃহৎশক্তির মধ্যে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধের কিছু আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন চেয়েছিল ভারত-পাকিস্তানকে একটি ব্লক হিসেবে দাঁড় করিয়ে চীনের প্রভাবকে কমিয়ে আনা। এজন্য ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ থামানোর আন্ত রাশিয়া মধ্যস্থতা করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ভারতের সাথে সোভিয়েত রাশিয়া

মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পাকিস্তানের সাথে আসন্ন যুক্তি জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সমরাত্মক থেকে শুরু করে সবদরনের সহায়তা ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট থেকে পেয়েছিল। মূলত দুটি দিক থেকে আভের আশায় সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করে।

প্রথমত, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব আটকানো।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিকভাবে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা চলছিল, সেইসময় পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল ভাল। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিল এবং উভয় দেশের মধ্যে সামরিক চুক্তি ছিল। এজন্য রাশিয়া চেয়েছিল পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দু'ভাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর কৃটনেতিক দিক্ষে অর্জন করতে। কাজেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তি সোভিয়েত রাশিয়া তার উপমহাদেশের নীতিতে অনুকূল নুয়োগ সৃষ্টি করে। এ নীতি প্রণয়নে মতাদর্শের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ প্রধান ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে। এ নির্বাচনে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কিছুটা মক্ষে ঘোষ আওয়ামী লীগের নিরক্ষুশ বিজয় মক্ষের নেতাদের আশান্বিত করেছিল। তাদের ধারণা ছিল কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে পাকিস্তান ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। কিন্তু পাকিস্তানিদের গণহত্যা এ সম্ভাবনাকে অনিশ্চিত করে দেলে। কাজেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন করা ছাড়া রাশিয়ার কাছে আর কোনো বিকল্প ছিল না। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ যাতে দীর্ঘায়িত না হয় সেদিকে নজর ছিল রাশিয়ার। এতে ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ ও বিপুর্বী চেতনার বিকাশ ঘটাতো। যা ভারতে অখণ্ডতার প্রশ্নে অবশ্যই বিপদের কারণ ছিল। কাজেই মক্ষের লক্ষ্য ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আওয়ামীলীগের নেতাদের ক্ষমতাসীন করা। মোটামুটি উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলিই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সোভিয়েত নীতির প্রেক্ষাপট। এখানে পর্যায়ক্রমে সোভিয়েত নীতির বিভিন্ন পর্যায় উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম পর্যায়: ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির ২৪ তম কংগ্রেসে ব্রেজেনেভ তাঁর 'এশীয় নীতি' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের' উপর জোর দেন। কিন্তু গবেষকের ধারণা সোভিয়েত ইউনিয়নের বাংলাদেশ নীতি সম্পূর্ণ এ ঘোষণার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল।

১৯৭১ এর ২ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট পদগৰ্ণি ইয়াহিয়ার কাছে পাঠানো পত্রে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানান। এতে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রক্ষণাত্মক ও নির্যাতন বন্ধ করে শাস্তিপূর্ণ সমাধান বের করার জন্য আহবান জানানো হয়। এ পত্রের মাধ্যমে আরও বলা হয়েছিল যে, এমন একটি শাস্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করা উচিত, যেন পূর্ব পাকিস্তানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এসময় এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত রাশিয়া পাকিস্তানকে প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য অব্যাহত রেখেছিল। উল্লেখ্য, এসময়েই পাকিস্তানের প্রথম ইস্পাত কারখানা ও পারমাণবিক শক্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত সোভিয়েত সাহায্য চূড়ান্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়: এ পর্যায়ে পাকিস্তানের পক্ষে চীন মার্কিন যৌথ সমর্থনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মক্ষের নীতিতে কিছু বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জুলাই মাসে কিসিঞ্চার বেইজিং থেকে ফিরে ভারতের রাষ্ট্রদূত 'ঝা'কে বলেছিলেন যে, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করলে চীন হস্তক্ষেপ করতে পারে। এতে ভারত বেশ উৎস্থি ও শক্তিত হয়ে পড়ে। মক্ষের অবস্থাও ছিল 'তথেবচ'। কাজেই দিল্লি ও মক্ষের পারম্পরিক নিরাপত্তা জোরদারের উদ্দেশ্যেই স্বাক্ষরিত হয় ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি (৯ আগস্ট, ১৯৭১)। এ চুক্তি পশ্চিম দুনিয়ায় বোমা বিস্ফোরণের মত মনে হয়েছিল। এ সময় মক্ষের নীতিতে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এটি হলো বাঙালি এবং বাংলাদেশ বিরোধী কোনো সমাধানের বিরুদ্ধে ভারত-

রাশিয়ার তৎপর ভূমিকা পালন। তবে দুদেশের নীতিতে একটি সুস্থ পার্থক্য ছিল। ভারত চেয়েছিল আওয়ামী জীগ নেতৃত্বাধীন স্বাধীন বাংলাদেশ অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য ছিল আখণ্ড পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আওয়ামী জীগকে বসানো।

তৃতীয় পর্যায়: সেপ্টেম্বর ও নভেম্বরের মধ্যে মঙ্গোর নীতিতে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, দেশটি ভারতের বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধীর এই যুক্তি সমর্থন করেছিল যে, বাংলাদেশ সংকটের যে কোনো সমাধানে বাঙালিদের জনপ্রতিনিধির মতামত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, এ সময় মঙ্গো ভারতের মাধ্যমে বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রামকে মঙ্গো-বেঁয়া করার চেষ্টা করে। এ নীতির ফলে সেপ্টেম্বর মাসে মঙ্গোপন্থী আওয়ামী সদস্যদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। একই সময়ে জাতিসংঘে প্রেরিত বাংলাদেশ মিশনের সদস্য হিসেবে মঙ্গোপন্থী অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ অন্তর্ভুক্ত হন। বাদ পড়েন পশ্চিমা ঘেঁষা কয়েকজন। তৃতীয়ত, এ নীতি অব্যাহত রেখেই মঙ্গো চেয়েছিল যেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পৃথিবী যুদ্ধ শুরু না হয়। যদিও এই নেপথ্য কূটনীতি যুদ্ধ এড়াতে পারেনি।

চতুর্থ পর্যায়: ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ৪-১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশ সংকট এবং একই সমান্তরালে সারা বিশ্বের জন্য আলোড়িত সংবাদ ছিল তিনটি বড় শক্তির কূটনৈতিক দল। মঙ্গোর দৃষ্টিতে বাংলাদেশ সংকট সমাধানের উপায় হলো, শেখ মুজিবের মুক্তি এবং জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া। একই কারণে মঙ্গো-বেইজিং-ওয়াশিংটনের প্রস্তাবগুলো উত্থাপিত হলেই ভেটো প্রয়োগ করে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অচলাবস্থার সুযোগেই ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার পতন হয়। পৃথিবীর বুকে জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।

৩৪.৭ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত

Specialist View on the Contributions of Soviet Union in the Liberation War of Bangladesh

অফিসের ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন মনে করেন যে, “গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, শেষ পর্যায়ে সোভিয়েত নীতিতে এক ধরনের দোদুল্যমানতার উপকরণ ছিল। তবে পাশাপাশি বাংলাদেশপন্থী প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছিল”।

ভারতীয় গবেষক Devendra Kaushik তাঁর Soveit Relation with India and Pakistan- এ মন্তব্য করেছেন নভেম্বর মাসের পূর্ব পর্যন্ত USSR এর লক্ষ্য ছিল বাঙালিদের স্বায়ত্ত্বাসনকে সমর্থন ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে আওয়ামী জীগকে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন করা। অন্যদিকে নভেম্বরের পর ভারত বাংলাদেশের যৌথ সামরিক অভিযানের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরের প্রশ্নে মঙ্গো ধীরে ধীরে সমর্থন ব্যক্ত করে।

আলোচনার শেষপ্রাণে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের নাগরিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ছিল অকুণ্ঠ। যদিও কোশলগত কারণে প্রথমেই তারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দেয়নি কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় যখন শান্তিপূর্ণ সমাধানের সবপথ বন্ধ হয়ে যায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা শুরু করে তখন সোভিয়েত ইউনিয়নও সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দেয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান ছিল অনব্যীকার্য।

৩৪.৮ চীনের ভূমিকা The Role of China

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল চীন। অপর দুই দ্বিতীয় শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সেচিন ইউনিয়নের তৃতীয় চীন ছিল পাকিস্তানের নিকটবর্তী এবং সীমান্তপথে। ফলে এই অবস্থায় চীনের পার্শ্ব ছিল দুর্গম অধিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উকৰ পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শাস্তিপূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যিক ঘোষণার ফলে চীন সোভিয়েত দ্বন্দ্ব উকৰ হয়। ফলে সোভিয়েত রাশিয়া যখন উপমহাদেশে ভারতের সাথে আধিক্য বিভাগের চেষ্টা চালায় তখন চীন-ভারতের পক্ষ পাকিস্তান, যে রাষ্ট্রটি উপমহাদেশের অপর শক্তিশালী রাষ্ট্র তার সঙ্গে স্বত্ত্বান্বিত পচ্চে তোলে। এভাবে বাংলাদেশের প্রতি চীনের বৈরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন চীনের নেতৃত্বে সুজি দুটি বৈশিষ্ট্য সক্ষনীয়। এক, চীন বাসাপির সংখ্যামূল ও নির্যাতনের প্রতি কোনোরূপ সহানুভূতি দেখানো থেকে মুচিত্তিভাবে বিষয় দাকে। দুই, চীন সরকার দ্বার্ধথিনভাবে পাকিস্তান সামরিক চক্রের প্রতি অনুর্ধ্ব সমর্থন জানায়। এমনকি মওলানা আব্দুল্লাহ আকুল আবেদনও চৈনিক নীতিতে কোনো পরিবর্তন সূচিত করতে পারেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রতি চীনের অনুসৃত নীতির পর্যামূলক নিখুঁতপন:-

প্রথম পর্যাম: মুক্তিযুদ্ধের উকৰ থেকে তি ডিসেম্বর পর্যন্ত চীনের ভূমিকা ছিল কিছুটা কৌশলী। এসবয়ে চীন পাকিস্তানপৰ্যন্ত প্রাকসেও বাঙালি বিরোধী কোনো মন্তব্য করেনি। চীনের প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় ১১ এপ্রিল 'পিপলস ডেইলি' পত্রিকা ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি চৌ-এন-সাই এর ১৩ এপ্রিলের চিঠির মাধ্যমে। 'পিপলস ডেইলি' অভিযোগ করেছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। উপরন্তু চিঠিতে পাকিস্তানের 'জাতীয় স্বাধীনতা' ও 'রাষ্ট্রীয় সার্ভিসেন্স' রক্ষায় চীনের দ্বার্ধথিন সমর্থনের কথা জানানো হয়েছিল। এসবয়ে চীন গোপনে পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে নেতৃত্ব শক্তি ও সাহস মুগিয়েছিল; এবং সরাসরি সামরিক উপকরণ ও সরবরাহ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চীনা রাইফেল ও অন্যান্য উন্নতমানের মারণান্ত্র দিয়ে বাঙালির প্রাণ সংহার করেছে। উক্তো এসময়েই চীন প্রায় ৪৫ মিলিয়ন ডলারের অন্ত সরবরাহ করেছিল পাকিস্তানকে। ১৯৭১ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে নিয়মিত পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে চীন সমরান্ত পাঠাতো। এছাড়া গেরিলা যুক্তে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য চীন অঞ্চলের মাঝে চাকায় দুইশো জন সামরিক বিশেবজ্ঞ পাঠিয়েছিল।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে চীন পাকিস্তানের তৎপরতা পিছিয়ে ছিল না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন ওয়াশিংটন সফরে যান তখন এই সকল উকৰ থেকে বিশ্বের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে ৫ নভেম্বর ভূট্টোর নেতৃত্বে একটি পাকিস্তানি কূটনৈতিক মিশন বেইঞ্জিং সফরে যায়।

দ্বিতীয় পর্যাম: পাক-ভারত যুদ্ধ উকৰ হবার পর জাতিসংঘে চীন সরাসরি বাঙালি বিরোধী ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। যুদ্ধ উকৰ হবার পর চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কড়া সমালোচনা করে এবং যুদ্ধ সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে দায়ী করে। ৫ ও ৭ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন দুটো প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রস্তাব দুটোর বিরুদ্ধে চীন প্রথম ভেটো প্রয়োগ করে নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করে যাতে ভারতকে আধাসী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যদিও প্রস্তাবটির উপর ভেট নেওয়ার আগে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

০৪.৯ চীনের পাকিস্তানের পক্ষ গ্রহণের কারণ Causes of China Support to Pakistan

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করার পিছনে কিছু কারণ সক্রিয় ছিল। যথা-

(ক) দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান রূপ প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সহযোগিতা করার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে আগস্ট মাসে ভারত-সোভিয়েত চূড়ি স্বাক্ষরিত হবার পর চীন এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল।

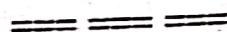
(খ) চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পাকিস্তান ছিল অন্যতম। সংকটকালে চীন যদি পাকিস্তানের পাশে না দাঁড়ায় তবে চীনের অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রের মনে চীনের বন্ধুত্ব সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হতো।

(গ) চীনের প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি শক্তিশালী পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা এবং তার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করা। এর মাধ্যমে চীনের দক্ষিণ সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতো।

(ঘ) চীন একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রশ্নে চীনে অনেক সমস্যা বিরাজমান। কাজেই অন্য একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র কোনো জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন করা চীনের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ ছিল না। কারণ এতে ভবিষ্যত তার অভ্যন্তরীণ সংহতির প্রতি হমকি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল।

সুতরাং বলা যায় যে, বিভিন্ন দিক ভেবেচিস্তেই চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে চীনের সরকারি নীতি যাই হোক না কেন তা চৈনিক জনগণ সমর্থন করেনি। যেমন, ৭ নভেম্বর ভুট্টোর বেইজিং সফরের সময়ে একদল যুবক ভুট্টো ও পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান দেয় এবং জানতে চায়, কেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের ন্যায়সমত অধিকার থেকে বাধিত করা হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিকারভাবে বলা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের শাসন শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার সর্বশ্রেণির জনগোষ্ঠী যে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিল তা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকেনি। ক্রমান্বয়ে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিসমূহ পারস্পরিক স্বার্থগত কারণে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারত যেমন বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য অস্ত্র ও সৈন্য সরবরাহ করেছে তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ থেকে বলা যায় যে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা ছিল ব্যাপক ও সুন্দরপ্রসারী।



তৃতীয় পাঠ: ৪ নভেম্বর (১৯৭২) সংবিধানের উপর তৃতীয় ও সর্বশেষ পাঠ শুরু হয়। মাত্র ২ দণ্ডের মধ্যে এ কাজ শেষ হয় এবং সেদিন বেলা ১টা ৩০ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের সময় গণপরিষদ সদস্যদের তুমুল করতালি ও হর্মসনির ঘৃণা দ্বারা বাংলাদেশ সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক পাস হয় এবং তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত ও স্বীকৃত গণপরিষদের সদস্যগণ ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর এবং ১৫ ডিসেম্বর স্বাক্ষর করেন। মহান বিজয় দিবসের প্রতি দ্বিতীয় জানিয়ে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর করা হয়। গণপরিষদের সদস্যদের স্বাক্ষরের জন্য সংবিধানের একটি হস্তলিখিত ও চিঠ্ঠিত পাঠ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মেত্তে এবং প্রতিজ্ঞার লিপিকার জনাব আব্দুর রউফ সাহেবের স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করা হয়। বাংলায় এ সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রধান্য পাবে। হস্তলিখিত সংবিধানটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

৪২.৮ ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

Salient Features of the Constitution, 1972

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধান স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই শুধু রচিত হয়নি, এর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধানগুলোর অন্যতম। সংবিধান প্রণয়নের ৪২ বছরের মধ্যে পনের বার সংশোধন করা হয়েছে। মেরুকোনো সংবিধান নির্দিষ্ট করগুলো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। বাংলাদেশের সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের জন্মালগ্নে যেসব বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয়েছিল সেগুলো একাধিক সংশোধনীর মাধ্যমে বদলন হয়ে বর্তমানে প্রচলিত আছে। বাংলাদেশ সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনী হলো ২০১১ সালের ৩০ জুন গৃহীত পঞ্জম সংশোধনী। উক্ত সংশোধনী অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত তাতে নিঃসন্দেহে একে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবনা:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত। প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবনায় আরো বলা হয়েছে, স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বে যেসব এলাকা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল, স্বাধীনতার পর সেসব এলাকা নিয়েই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠিত হবে।
- লিখিত দলিল:** এটি একটি লিখিত এবং অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত দলিল। সরকার পরিচালনায় সাধারণ নীতিসমূহ সুবিন্যস্তভাবে এতে লিখিত রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ এবং ৪২টি তফসিল রয়েছে।
- সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধানাবলী:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) অনুযায়ী সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য।
- রাষ্ট্রীয় মূলনীতি:** ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি আকারে রাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহের ঘোষণা সন্নিবেশিত আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ত, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংহারে নিশ্চয়তা প্রদান রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম নীতি হিসেবে ঘোষিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ছিল চারটি। যেকূন জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পরবর্তীকালে ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এ মূলনীতিগুলোতে নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন আনেনঠ ক. সর্বশক্তিমান আন্তর্ভুক্ত তায়ালার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থ. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গ. গণতন্ত্র এবং দ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার-এ অর্থে সমাজতন্ত্র। সর্বশেষ ৩০ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে পাস হওয়া সংবিধানের পক্ষদল সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে প্রণীত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ফিরে যাওয়া হয়।

১. মৌলিক অধিকার: সংবিধানের তৃতীয় ধারায় নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার তাগিদে কৃতগুলো মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন সাম্যের অধিকার চলাকেরা সভা সমিতি চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা; বাক-স্বাধীনতা; সম্পত্তির অধিকার; ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ও স্বাভাবিক মানবিক অধিকাবশ্যকে এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সংসদ প্রায় সকল অধিকারের ওপর আইনের দ্বারা যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।
২. জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন এবং তাদের এ নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। সংবিধানের পক্ষদল সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণ বাঙালি হিসেবে পরিচিত হবেন।
৩. পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার পার্লামেন্টের প্রাধান্য: সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপ্রধান হবেন নিয়মতাত্ত্বিক প্রধান এবং মন্ত্রীপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রী হবেন প্রকৃত শাসক। মন্ত্রীপরিষদ সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন।
৪. শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের প্রাধান্য: শাসনতন্ত্রের যে কোনো ধারা সংশোধন বা রদবদল করার জন্য পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিসূচক প্রস্তাব বা ভোট গ্রহণের বিধান সংবিধানে রয়েছে। তাছাড়া যুক্ত ঘোষণা বা যুক্তে অংশগ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের সম্মতি প্রয়োজন।
৫. বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা: বাংলাদেশ সংবিধানের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট নামে অভিহিত হবে। আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত এই সুপ্রিম কোর্ট শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে। সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী অর্থাৎ প্রশাসনিক অঙ্গসমূহ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করা হবে।
৬. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র: বাংলাদেশে যেহেতু কোনো প্রদেশ নেই, সেহেতু এখানে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যূন্তর থাকবে এবং দেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে।
৭. দুর্পরিবর্তনীয় সংবিধান: বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনগত দিক থেকে দুর্পরিবর্তনীয়। একে পরিবর্তন করতে হলে দরকার সংসদের দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন।
৮. এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। এর নাম জাতীয় সংসদ এর সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন (৩০০টি সাধারণ আসন এবং ৫০টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন)
৯. ন্যায়পাল: বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদে ন্যায়পালের বিধান রয়েছে। ন্যায়পাল যে কোনো মন্ত্রণালয় ও সরকারি কর্মচারীর যে কোনো কার্য সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবেন।
১০. ধৰ্মাসনিক ট্রাইবুনাল: সাধারণ বিচার বিভাগ ছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানে ধৰ্মাসনিক ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, পদোন্নতি, দণ্ড ও কর্মের মেয়াদ, রাষ্ট্রায়ন্ত্র উদ্যোগ ও সম্পত্তি

পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের ওপর প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের এখতিয়ার থাকবে। এ সম্মত বিষয় সাধারণ আদালতগুলোর কোনো এখতিয়ার থাকবে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল লিখিত দলিল। এতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক, অধিকারের প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয়ে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য গোচরে জনগণ, সেহেতু রাষ্ট্র জনগণের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে যুগোপযোগী করে তোলে। বাংলাদেশ সংবিধানও এই কারণে এ পর্যন্ত ১৫ বার সংশোধিত হয়েছে। এগুলো জনগণের আশা আকাঞ্চ্ছার বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছে।

৪২.৯ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

Fundamental Principles

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে (অনুচ্ছেদ ০৮-২৫) রাষ্ট্রপরিচালনার কিছু মূলনীতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি, এ সম্বন্ধে সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়, “যে সকল মহান আর্দশ আমাদের দ্বারা জনগনকে জাতীয় মুক্তির জন্য যুক্তে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রানোৎসর্গ করতে উদ্ধৃত করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সেই সকল আর্দশ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।” নিচে চারটি মূলনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

- জাতীয়তাবাদ:** ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত একক সত্ত্বাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযোগ্য মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের জড়িত। (অনুচ্ছেদ ৯)
- সমাজতন্ত্র:** মানুষের ওপর মানুষের শোষন থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতাত্ত্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো রাষ্ট্রের লক্ষ্য। (অনুচ্ছেদ ১০)
- গণতন্ত্র:** বাংলাদেশ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। (অনুচ্ছেদ ১১)
- ধর্মনিরপেক্ষতা:** ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ হলো সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা নিপীড়নের অবসান। (অনুচ্ছেদ ১২)

৪২.১০ মৌলিক অধিকার

Fundamental Rights

মৌলিক অধিকার হচ্ছে রাষ্ট্র প্রদত্ত সেসব সুযোগ সুবিধা যা নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাব বিকাশের জন্য মৌলিক অধিকার একান্ত প্রয়োজনীয় সংবিধানের সংশোধন কিংবা দেশে জরুরী অবহু জারি করা ছাড়া মৌলিক অধিকার স্ফূর্ত করা যায় না। মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকায় এগুলোর প্রের্ণ সীমিত হয়। সুতরাং মৌলিক অধিকার হচ্ছে নাগরিক জীবনের ও ব্যক্তিত্বকে বিকাশের জন্য সেসব অপরিহার্য শর্তবরী।